শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়-প্রণীত।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

সূচী-পত্র

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ।

সাবিত্রী-সত্যবান	...	...	১॥০
কুললক্ষ্মী	...	...	১৲
উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ	...	...	১।০
বঙ্গবিজয়	...	...	১৲

চিত্র-সূচী

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা, ২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্,

ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ কোঙার দ্বারা মুদ্রিত।

১৯১২

ভূমিকা।

ইংরাজী শিক্ষাদ্বারা আমাদিগের পার্থিব জ্ঞানের প্রসার যে বহুল পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু ঐ লাভের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিও অনেক হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি এই যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যারণ্যে প্রবেশ করিয়া আমরা প্রায় একেবারে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছি। অম্বরস্পর্শী ওক, ফার, পাইন প্রভৃতির গর্ব্বিত মহিমা দেখিয়া নিজ গ্রামস্থ অশ্বত্থ, বট, তাল, তমাল, কদম্ব, চন্দনাদির স্মৃতি আমাদিগের হৃদয় হইতে অনেকটা মুছিয়া যাইতেছে। সিতোপলি আধার মধ্যে বন্দিনী সৌদামিনীর জ্বলন্তচ্ছটা দেখিয়া জননীর মঙ্গলময় হস্তস্থিত মৃৎ-প্রদীপের স্নিগ্ধ রশ্মি আমাদিগের দৃষ্টিতে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ইংরাজী সাহিত্যের বিপুল গৌরব দেখিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী এক্ষণে নিজের জাতীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টি-সাধনে উদ্‌যোগী হইয়াছেন বটে, কিন্তু বিবিধ গুণে অলঙ্কৃত হইলেও সেই সকল পুস্তকের পত্রাবলী

মধ্যে আর্য্য আদর্শ প্রায়ই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বঙ্গের সাহিত্য-রথী এক্ষণে ভাবেন ইংরাজীতে, লেখেন বাঙ্গালা অক্ষরে ; ভাষা বাঙ্গালা আভিধানিক বটে, সংস্কৃত সমাসচ্ছটা ও পদাবলীর অভাবও তাহাতে নাই ; কিন্তু তবু যেন কেমন সেই হবিষ্য সদৃশ ভোজ্য হইতে ঈষৎ পলাণ্ডু রসের গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে ! ইংলণ্ডের তুষার কাহারও কাহারও এমন দৃষ্টিবিভ্রম জন্মাইয়া দিয়াছে যে, তাঁহারা নিজদেশবাসীর দেহের বর্ণ কিরূপ, তাহাও ভুলিয়া গিয়াছেন ! তাঁহাদের নায়িকারা শুভ্র-বর্ণা, সুন্দরীদিগের হাসিটুকু পর্য্যন্ত শুভ্র ! সুকুমার হিন্দু বালক-বালিকারা বিদ্যালয়ে বসিয়া বর্ত্তমান শিক্ষিত গ্রন্থকারের রচিত পুস্তক পাঠ করিতেছে—"এক বৃদ্ধার দুই কন্যা ও এক কুক্কুট ছিল ইত্যাদি—"। উপাখ্যান-পুস্তকে বাঙ্গালার সাহিত্য-বাজার ভরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে গৌরী, অরুন্ধতী, সাবিত্রী, সীতা, দ্রৌপদী, দময়ন্তীর আদর্শের ছায়াও দেখিতে পাওয়া যায় না ! বাঙ্গালী-লিখিত ক্ষত্রিয় বীর এক্ষণে রিপন কলেজের চতুর্থ বার্ষিকী শ্রেণীর ছাত্র ; বর্ত্তমান বঙ্গের আখ্যায়িকার কুন্দমালা, বিজলীবালা এক্ষণে শাটী-পরিধানা সিঁথিতে সিন্দূর-বিন্দু-ভূষিতা জুলিয়েট বা ডায়েনা !

কিন্তু প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম-বলে প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। মোহন বংশীরবও কাণের ভিতর দিয়া মরমে

পশিয়া বাঙ্গালীর অন্তর্নিহিত স্বদেশ-প্রেম জাগাইয়া তুলিয়াছে,—বুঝি বা আবার যমুনা উজান বহিল ?

ইংরাজী-বিদ্যায় পরমপণ্ডিত বাঙ্গালী লেখকের দৃষ্টি আবার ভক্তি ভাবে পুরাণের দিকে ফিরিয়াছে ; মেকলে-মিল-ঘটিত অজীর্ণ-দোষে হনুমানের লাঙ্গুল দেখিয়া বাঙ্গালী আর রামায়ণকে জাতীয় অমঙ্গলের নিদানস্বরূপ মনে করিতেছেন না ; মহাভারত আর "ছিঃ ছিঃ মহাভারত নয় !" অল্পদিনের মধ্যেই কয়েকটী পৌরাণিক আখ্যায়িকা উৎকৃষ্ট গদ্যে-পদ্যে লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে ; বাঙ্গালীর বহির্বাটী ও অন্তঃপুর উভয় বিভাগের পাঠ-গৃহ এক্ষণে সেই সকল পুণ্যপূর্ণ গ্রন্থাবলীর অবস্থানে পবিত্র !

আজ আমি এই যে পুস্তকের প্রস্তাবনা লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি, ইহা রাজা হরিশ্চন্দ্রের অতি প্রাচীন পবিত্র আখ্যায়িকা। ত্রিশঙ্কু-পুত্র রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের নাম প্রথমে ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় ; বেদে কল্পিত কথা নাই, ঋকে যাহা আছে, তাহা ঋতম্—সত্যম, ঋকে কথিত হরিশ্চন্দ্র-বিবরণী বোধ হয় ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণে যযাতির নরমেধ-যজ্ঞের গল্পে পরিণত হইয়াছে। এখানে ত্রিশঙ্কু-পুত্র হরিশ্চন্দ্রের পরিবর্ত্তে নহুষ-পুত্র যযাতি যজ্ঞকর্ত্তা, আর অজীগর্ত্ত-

পুত্র শুনঃশেপের স্থলে সিদ্ধার্থপুত্র কুশ বলি-পশু। হরিশ্চন্দ্রের যে আখ্যায়িকা এক্ষণে সমগ্র হিন্দুস্থানে বিদিত, তাহার পূর্ব্বরূপ আমরা মার্কণ্ডেয়-পুরাণে প্রথম দেখিতে পাই। এই পুরাণোক্ত হরিশ্চন্দ্র-কথাই আর্য্যক্ষেমীশ্বর নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করেন; সংস্কৃত চণ্ডকৌশিক নাটক ভারতের দাক্ষিণাত্য প্রদেশকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে।

তারপর বাঙ্গালা দেশের কথা; বাঙ্গালী যখন বর্গীর ভয়ে গৃহতাড়িত, ফৌজদারের করে প্রপীড়িত, যখন বাঙ্গালীর ভাষা গিয়াছিল, সাহিত্য ছিল না, তখন বহু-বহু ভাগ্যফলে জ্ঞানহীন দীন বাঙ্গালী দুই জন অমর শিক্ষক লাভ করিয়াছিল। সেই দুইজন বঙ্গের চিরপূজ্য কাশীরাম ও কৃত্তিবাস। ইঁহারা বাঙ্গালী-জন-শিক্ষক, বাঙ্গালীর অন্তঃপুরেরও শিক্ষক। পাশ্চাত্য প্রদেশে যেমন অনেক মহামনীষীর অভ্যুদয় হইয়াছে, তেমনি সেখানকার নিরক্ষর জন-সাধারণ মূর্খ—অতি মূর্খ, তাহাদের অনেকের প্রবৃত্তি হীনতায় বন্য পশুদিগকেও লজ্জা দেয়! আমাদের এ ভারতে—নিরক্ষর নর-নারী অনেক, কিন্তু সেরূপ মূর্খ মানব যে ভারতে নাই, তাহার প্রধান কারণ বঙ্গে কাশীরাম ও কৃত্তিবাসের এবং উত্তর ভারতে তুলসীরাম দাসের শুভ আবির্ভাব।—ইংরাজী-মসী-আর্দ্র দেশ-

ভূমিকা।

সংস্কারকগণ ভারতে আইনবলে জবরদস্তি-শিক্ষা প্রচলনের জন্য মল্লকচ্ছভাবে বস্ত্র পরিতেছেন; তাঁহারা কি জানেন না যে, জবরদস্তির সঙ্গে ভালবাসা বা প্রাণের টানের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না? পেয়াদার গুঁতায় পাঠশালায় যাইতেই হইবে, কিন্তু পড়িবে ত মন!—রুলের গুঁতায় কি মন প্রফুল্ল করিয়া তুলিবে? আর আমাদের কাশীরামের জবরদস্তিটা দেখুন,—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥"

ধর্ম্মভীরু পুণ্য-পিপাসী ভারতবাসীর পক্ষে ইহার মত সুমিষ্ট লোভনীয় Compulsion আর কি আছে?

বঙ্গের কবি কৃত্তিবাস তাঁহার কৃত অমর রামায়ণে হরিশ্চন্দ্রের গাথা গাহিয়া বঙ্গের নর-নারীকে, বৃদ্ধ-যুবা-শিশুকে ধর্ম্ম শিখাইতেছেন, সত্য শিখাইতেছেন, আত্মত্যাগ শিখাইতেছেন, বিপদে ধৈর্য্য শিখাইতেছেন, আর মধুর করুণ-রসে একেবারে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন।

সুরেন্দ্রবাবু! তুমি ধন্য! তুমি ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত; কিন্তু তোমার লেখনী জাতিভ্রষ্ট হয় নাই। তুমি অতি-প্রাচীন

ভূমিকা।

সভ্যদেশের অতি-প্রাচীন পুণ্য-কথা অতি সুন্দর, প্রাঞ্জল ও সরল গদ্যে লিখিয়া, সুন্দর কাগজে, সুন্দর অক্ষরে, মুদ্রিত করিয়া, আমার ভ্রাতা-ভগিনী-পুত্র-কন্যাগণের করে তুলিয়া দিতেছ; ইহাই মহাপুণ্যকর্ম্ম, ইহাই সত্য স্বদেশবাৎসল্য! দেশের ধর্ম্ম, দেশের আহার্য্য-ব্যবহার্য্য, দেশের ভাষা, সাহিত্য, গল্প-গাথা, আমোদ, প্রমোদ, খেলা প্রভৃতিকে যিনি ভাল বাসিবেন, ভাল-বাসিয়া তাহার মলা-ধূলা ধৌত করিয়া সংস্কৃত করিবেন, তিনিই স্বদেশ-প্রেমিক। তুমি সুরেন্দ্রনাথ! সুপথে গিয়াছ, সুপথে থাক—তোমার মঙ্গল হইবে; তোমার পুস্তক একদিন বঙ্গের গৃহে গৃহে বিরাজ করিবে!

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

গত বৎসরে এইদিনে "সাবিত্রী সত্যবান" বাহির হইয়াছিল, এবার "শৈব্যা" বাহির হইল। "সাবিত্রী-সত্যবানে"র মত জন-সাধারণের নিকট "শৈব্যা" আদরণীয় হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে আমি দুই জনের নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। শ্রদ্ধাস্পদ প্রকাশক মহাশয়ের পুত্র—শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবু এবারও "সাবিত্রী-সত্যবানে"র ন্যায় "শৈব্যা"র জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। ষ্টার থিয়েটারের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই উভয় ব্যক্তির এই উভয় প্রকার সাহায্য না পাইলে, শৈব্যা কখনই এ ভাবে পাঠক-পাঠিকাদিগের সমীপে উপস্থিত হইতে পারিত না।

গ্রন্থকারের নিবেদন

অমৃতবাবুর "হরিশ্চন্দ্র-নাটক" পাঠকমাত্রের নিকটই পরিচিত। তেমন উৎকৃষ্ট নাটক বঙ্গসাহিত্যে একরূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ হেন "হরিশ্চন্দ্র" প্রণেতার ভূমিকা-মুকুট-ভূষিত হওয়ায় আমার "শৈব্যা" গৌরবান্বিত! নানারূপ বৈষয়িক গোলযোগ ও আত্মীয়-স্বজনের অসুখ-বিসুখাদির ভিতর জড়িত থাকিয়াও তিনি যে অপূর্ব্ব বদান্যতা, প্রীতি ও সৌজন্যের তাড়নায় "শৈব্যা"কে এইরূপে গৌরবান্বিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহার সে প্রীতি, সে সৌজন্য ও সে বদান্যতা আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। জগদীশ্বর তাঁহার মঙ্গল করুন। ইতি।

কলিকাতা
৮ই আশ্বিন
১৩১৮ সন, বাং।

গ্রন্থকার

উপক্রমণিকা

(১)
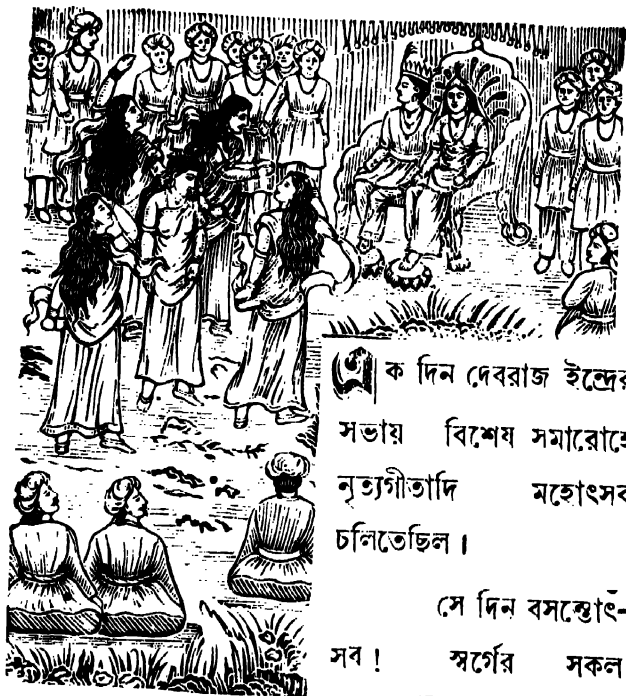
এক দিন দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় বিশেষ সমারোহে নৃত্যগীতাদি মহোৎসব চলিতেছিল।

সে দিন বসন্তোৎসব! স্বর্গের সকল দেবতা সে দিন উত্তম বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া আসিয়াছেন! চারিদিকে

ধ্বজ, পতাকা ও পারিজাতগুচ্ছ শোভা পাইতেছে। নন্দনকাননের সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত পারিজাতগুচ্ছ সংগ্রহ করিয়া দেববালাগণ সে দিন স্বহস্তে চারিদিক্ সাজাইয়াছেন, স্তবকে স্তবকে অপূর্ব্ব হার গ্রথিত করিয়া দেবতাদিগের কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছেন, কতক কতক বা নিজেদের চারু কুন্তলে গুঁজিয়াছেন। সেই কুসুমরাশির সৌরভ, অঙ্গমর্দ্দিত চন্দনের সৌরভে মিশ্রিত হইয়া চারিদিক্ আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। নক্ষত্রগণ সেদিন আকাশ ছাড়িয়া সেই দেবসভায় আলোক দিতে আসিয়াছে। তাহাদের উজ্জ্বলপ্রভায় দেবতাদিগের মণিমুক্তাখচিত বেশভূষা হারকখণ্ডবৎ জ্বলিতেছে। সভার মধ্যস্থলে নাটমন্দিরের অঙ্গনে শত সহস্র উজ্জ্বল প্রদীপমালা। সেই প্রদীপমালার উজ্জ্বলালোকে স্নিগ্ধ দেহরত্ন প্রদীপ্ত করিয়া শত শত দিব্যকণ্ঠী দিব্যাঙ্গনা গাহিতেছে—তালে তালে নৃত্য করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব বাদ্য ধ্বনি!—চারি-পার্শ্বে বসিয়া গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব যন্ত্রে

সে ধ্বনি তুলিতেছেন। একটা সুমধুর সুরের তরঙ্গে চারিদিক্ ভাসিয়া যাইতেছে।

দেবতাগণ সেদিন উন্মত্ত—অপ্সরাগণ বিহ্বল! নৃত্যের স্রোতে, গানের স্রোতে ও হাসির স্রোতে তাহাদের কবরী-বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছে, অঙ্গের চারু বস্ত্র শ্লথ হইয়া খসিয়া পড়িতেছে, তাহাতে চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গের উজ্জ্বল-স্নিগ্ধ আভা ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের মত চমকিতেছে। চারিদিকে ঘন ঘন জয়ধ্বনি ও 'সাধু সাধু' রব উঠিতেছে! তাহাতে নর্ত্তকীদিগের দ্বিগুণ উত্তেজনা বাড়িতেছে।

তিলোত্তমা, রম্ভা, উর্ব্বশী, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণ এ সব ব্যাপারে অভ্যস্তা। তাহারা হাসিতেছে, গাইতেছে, নাচিতেছে, তথাপি সংযত হইয়া চলিতেছে; কিন্তু অপরাপর নর্ত্তকীদিগের সে দিন সংযমের বন্ধন নাই। তাহারা আমোদস্রোতে গা ঢালিয়া উন্মত্তের মত তালে তালে পা ফেলিয়া যাইতেছে। অভ্যস্তপদ আপনা-আপনি উঠিতেছে,

নামিতেছে, ঘুরিতেছে—নর্ত্তকীরা তাহার হিসাব রাখিতেছে না। চারিদিকের উজ্জ্বল শোভা, অপূর্ব্ব সৌরভ এবং সুমধুর বাদ্যরব এক হইয়া সেদিন তাহাদিগের মস্তিষ্কের স্থিরতা অপহরণ করিয়াছে। তাহারা দেবতাদিগের ঘন ঘন জয়ধ্বনিতে উল্লসিত হইয়া কেবলই নাচিতেছে, কেবলই গাইতেছে, কেবলই নয়নকোণে মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুদ্দামের সৃষ্টি করিতেছে।

অকস্মাৎ সর্ব্বনাশ হইল! কয়েকটি অসাবধান উন্মত্ত বালা হঠাৎ পদস্খলন করিয়া বসিল—মুহূর্ত্তে তাল ভঙ্গ হইয়া গেল!

তেমন একটা বিরাট-আমোদ-স্রোত হঠাৎ সংক্ষুব্ধ, উত্তেজিত ও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। পথরোধকারী উপলখণ্ডকে যেমন গিরিপ্রস্রবিণী প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হঠাৎ শত সহস্র মত্তমাতঙ্গের বলে আক্র-মণ করে, সেই বিপুল আমোদ-স্রোতও তেমনি বাধা-প্রাপ্ত হইয়া হঠাৎ এক বিশ্ববিধ্বংসিনী মূর্ত্তিতে সেই

অসাবধান নর্ত্তকীদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। তবলাধারী বাজাইতে বাজাইতে হঠাৎ বিরক্ত হইয়া তবলা দূরে নিক্ষেপ করিলেন; মৃদঙ্গ, বাদকের উত্তেজিত হস্তের চাপড় খাইয়া বিদীর্ণ হইয়া গেল; পাখোয়াজ, ওস্তাদের ধাক্কা খাইয়া দূরে গড়াইয়া পড়িল; বীণা, সেতার, এস্‌রাজ, তান্‌পূরা প্রভৃতি যন্ত্রগুলি বার-কয়েক ঘং ঘং করিয়া ক্রুদ্ধ স্বর উচ্চারিত করিয়া ছিন্ন হইয়া গেল। উর্ব্বশী মেনকা প্রভৃতি অপ্সরারা রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে নূপুর আছড়াইয়া দূরে যাইয়া বসিয়া পড়িল! দেবসমাজ একমুহূর্ত্তে নিস্তব্ধ হইয়া গেল!

তখন চারিদিকে 'কে এমন করিল? কে এমন করিল?—কার এমন স্পর্দ্ধা!' বলিয়া একটা তুমুল রব উঠিল। চারিদিক্ হইতে দেবতাদিগের আরক্ত-লোচনগুলি ক্রোধানল উদ্গিরণ করিল। একটা সামান্য মজলিসে তালভঙ্গ হইয়া গেলে, লোকের কত ক্ষোভ হয়, আর তেমন একটা দেবতা-গন্ধর্ব্বের অপূর্ব্ব দর-

বারে তালভঙ্গ হইয়া গেল—ব্যাপারখানা বুঝিতেই পারিতেছ। দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্নর, সকলেই রাগে গরগর করিতে লাগিলেন।
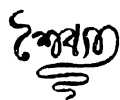
সেই বিস্তীর্ণ সভার এক পার্শ্বে একটি সুসজ্জিত উজ্জ্বল মর্ম্মর বেদীর উপরে নানা-রত্নখচিত দিব্যাসনে বসিয়া দেবরাজ ইন্দ্র এতক্ষণ প্রশান্তভাবে এই ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন; হঠাৎ সভার এই উচ্ছৃঙ্খল মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মধুর শান্ত বচনে দেবতাদিগকে নীরব করিয়া রক্ষীদিগকে কহিলেন, "রক্ষকগণ, যে অল্পবুদ্ধি, অসাবধান নর্ত্তকীগণ তালভঙ্গ করিয়াছে, তাহাদিগকে আমার সমীপে লইয়া আইস—আমি ইহার বিচার করিব।"

চকিতা, স্তব্ধা, আলুলায়িত-কুন্তলা পাঁচটী নবীনা নর্ত্তকী ভীতিবিহ্বল পদে কাঁপিতে কাঁপিতে রক্ষিগণ-পরিবেষ্টিতা হইয়া দেবরাজের সমীপে অগ্রসর হইল। তখনও তাহাদের আলুথালু বেশভূষা সংযত হয় নাই, তখনও তাহাদের বিলাসরাগরঞ্জিত নয়নগুলি আরক্তিম

আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে, বরং ভীতিবিহ্বল হইয়া আরও অসংযত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের চূর্ণ কুন্তল-পাশ তখনও বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া তাহাদের চাপল্যের পরিচয় দিতেছে ;—দেবরাজ তাহাদিগকে দেখিয়া আরও কুপিত হইলেন। অপ্সরারা ব্যাপার বুঝিয়া অবনত বদনে জোড়করে দাঁড়াইয়া রহিল।

দেবরাজ কহিলেন,—"তোমরা ! তোমরা তাল ভঙ্গ করিয়াছ ? এত বড় আস্পর্দ্ধা তোমাদের, আমার সভায় তালভঙ্গ কর, অসংযত হও ! —তোমাদের গুরুতর শাস্তি দিব।"

দেবরাজের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া নর্ত্তকারা কাঁপিয়া উঠিল। দেবরাজ আবার কহিলেন,—

"তোমরা যে অপরাধ করিয়াছ, তাহাতে তোমা-দের স্বর্গে থাকা অসম্ভব। আমি অভিসম্পাত করিতেছি, আজ হইতে তোমরা এই জরামৃত্যুরহিত দেবলোক পরিত্যাগ করিয়া সকল দুঃখের আগার মনুষ্যলোকে

যাইয়া বাস কর। মনুষ্যলোকের দারুণ যন্ত্রণা স্পর্শে তোমাদের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হৌক্।"

দেবরাজ যদি অপ্সরাদিগকে সহস্রবৎসর স্বর্গে বন্দী করিয়া রাখিবার আদেশ প্রদান করিতেন, তাহা হইলে তাহাদের তত দুঃখিত হইবার কারণ ছিল না। কিন্তু স্বর্গ-ত্যাগের কথায় তাহাদের নয়নে অজস্র অশ্রুধারা বহিল। তাহারা ছিন্নলতিকার মত ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। তাহা-দের অবনত মস্তকগুলি দেবরাজের সিংহাসনের পদ চুম্বন করিয়া তাঁহার কৃপা আকর্ষণ করিবার দুরন্ত প্রয়াস পাইল।

তাহাদের অবস্থা দেখিয়া দেবতাদিগের মধ্যে অনেকের একটু একটু ক্লেশানুভব হইল। হায়, হতভাগিনীরা বুদ্ধির দোষে প্রমাদ ঘটাইয়াছে, নিজ অবস্থা বুঝিতে পারে নাই! বারেকের জন্যেও কি তা'রা ক্ষমা লাভ করিতে পারে না? তাহারা ব্যথিত হৃদয়ে দেবরাজের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল।

দেবরাজ তাহাদের মনোগত ভাব বুঝিলেন।

তাঁহার হৃদয়ও এই করুণ দৃশ্যে একটু একটু করিয়া বিগলিত হইতেছিল। তিনি ভাবিলেন, "বড় অধিক গিয়াছি, এতদূর না গেলেও বুঝি হইত। যাহা হউক, আমার কথা অন্যথা হইবার নহে,—ইহার অন্য উপায় করিব।"

এই ভাবিয়া তিনি পুনঃ অপ্সরাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন,—"বুঝিতে পারিতেছি, এতক্ষণে তোমাদের চৈতন্য হইয়াছে, অনুতাপও জন্মিয়াছে। যাও—আমি তোমাদের উদ্ধারের এক উপায় করিলাম। মর্ত্তো বিশ্বামিত্র মহর্ষির এক তপোবন আছে, কোশলের রাজধানী অযোধ্যানগরী তাহার অদূরে অবস্থিত। তোমরা যাইয়া সেই মহর্ষির আশ্রমে অবস্থিতি কর। যদি কোনও রূপে কখনও একবার অযোধ্যা-নরেশের সাক্ষাৎ পাও, তবেই আবার স্বর্গলাভে সমর্থ হইবে। আশ্রমের শান্তিময় দৃশ্যে তোমাদের স্বর্গের শোকও অনেকটা উপশমিত হইয়া যাইবে।"

দেবরাজের এই কৃপাবাণী শুনিয়া অপ্সরারা

অনেকটা আশ্বস্ত হইল,—দেবতারাও সন্তুষ্ট হইলেন। অপ্সরারা তখনই কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে দেবরাজ ও দেবসমাজকে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগের জন্য সভাস্থল পরিত্যাগ করিল।

(২)

যথাসময়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপোবনে আসিয়া স্বর্গচ্যুতা অপ্সরারা আশ্রয় গ্রহণ করিল। তপোবনের অপূর্ব্ব-শোভা-সম্পদ্ তাহাদের স্বর্গের বিচ্ছেদটাকে অনেকটা লঘু করিয়া দিল।

বিশ্বামিত্রের তপোবন বড় সুন্দর! প্রাচীন-কালের তপোবনের পরম শান্তিময় ছবিখানি হৃদয়ে প্রতিফলিত করিতে চাও তো একবার মানসনেত্র উন্মীলিত কর। সেই অচ্ছোদ-সরোবর মনে পড়ে? সেই মালিনী নদীর তট- সৈকত-লীন-হংসমিথুনা মালিনী

নদী—তত্তীরে নির্ভীক-মুগ্ধস্বভাব-কুরঙ্গীকুল--শোভিত হিমালয়ের চারুশৃঙ্খল মনে পড়ে? সান্ধ্য-রক্তিমরাগ-রঞ্জিত বশিষ্ঠের অপূর্ব্ব আশ্রম,—তাহার কোথাও রোমন্থনরত ধেনুপাল, কোথাও জলাশয়োত্থিত সদ্যঃকর্দ্দমাক্ত বরাহকুল, কোথাও আবাসবৃক্ষ-প্রত্যাগমনোন্মুখ সঙ্গীত-মুখর বিহঙ্গমরাজি, আর সেই সমগ্র শ্যামায়মান বনভূমির মধ্যে পুত্রমুখদর্শনলোলুপ বনবাসী রাজদম্পতীর তপঃ-প্রফুল্ল মুখ দু'খানি মনে পড়ে? সেই সারস-পঙ্‌ক্তি-খচিত পঞ্চবটীর নির্ম্মলাকাশ, তন্মধ্যে পুষ্পকরথারোহণে জনকনন্দিনীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া রঘুমণি, তার নীচে ঘনশ্যাম ক্রমবর্দ্ধিত-কলেবর সহকার-শ্রেণীর অপূর্ব্ব-শোভা—রঘুবর প্রিয়তমাকে সেই সব অপূর্ব্বদৃশ্য একটীর পর একটী করিয়া দেখাইতেছিলেন—প্রাচীন ভারতের সেই সব স্বপ্নময় আলেখ্যগুলি মনে পড়ে?

তেমনই একটী স্বপ্নময় দৃশ্যের ভিতরে, তেমনই একটী সুন্দর তপোবনে অপ্সরারা আসিয়া বাস করিতে লাগিল। মহর্ষি বিশ্বামিত্র সর্ব্বদা এ তপোবনে থাকেন

তপোবনে অপ্সরাগণ

না। তীর্থপর্য্যটনে ও নিভৃত গিরিকন্দরে তপস্যাদিতে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হয়। কখনও কখনও যজ্ঞাদি উপলক্ষে এই তপোবনে তাঁহার পদার্পণ হয় মাত্র। তখন আশ্রমের অপূর্ব্ব শান্ত-শিষ্টভাব সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহার তপঃক্লিষ্ট দেহযষ্টিকে পুলকস্নিগ্ধ করিয়া তোলে।

এ হেন নিবিড় তপোবনে আসিয়া অপ্সরাগণের কোনই দুঃখের কারণ রহিল না। তাহারা মনের সুখে দিবারাত্রি চারিদিকে ভ্রমিয়া বেড়াইতে লাগিল। সুন্দর বৃক্ষের কাণ্ডে কাণ্ডে সুন্দর সুন্দর পাখী অপূর্ব্ব মাধুরী-ময় কণ্ঠে অপূর্ব্ব সঙ্গীত ধ্বনিত করিত, পঞ্চসখী নব-দূর্ব্বাদলে বসিয়া রোমাঞ্চিতদেহে সেই গান শুনিত। কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিল, দয়েল, পাপিয়া প্রভৃতি আত্ম-গোপন করিয়া পঞ্চমে সুর তুলিয়া মায়াময় স্বরতরঙ্গে সেই শ্যামায়মান বনভূমির মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব শান্তিধারা সেচন করিত, পঞ্চসখী উদাসপ্রাণে ব্যাকুল অন্তরে সেই স্বর শুনিত, আর মধ্যে মধ্যে চকিতে আপনা-

দের অন্তরের অন্তরে কি এক বিস্মৃত অতীত কাহিনার সুখময় স্বপ্নের অস্পষ্ট আলেখ্য দেখিত। তখন তাহাদিগের স্থির, স্তব্ধ মূর্ত্তিগুলির দিকে চাহিলে কেহ তাহাদিগকে সজীব মূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করিতে পারিত না—অপূর্ব্ব দক্ষ শিল্পীর ক্ষোদিত কয়টী প্রস্তরমূর্ত্তি বলিয়াই ভ্রম করিত। প্রভাতের রবিকর-প্রফুল্ল পুষ্পিত লতিকার পল্লবে পল্লবে ভ্রমরগণ আকুল হইয়া 'গুণ গুণ' রবে ভ্রমণ করিত, অপ্সরারা তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ততোধিক সুমধুর রবে নূপুর ধ্বনিত করিয়া অনুসরণ করিত। জ্যোৎস্না-পুলকিত নিশায় অসংখ্য পুষ্পবৃক্ষের কাণ্ডে কাণ্ডে সুরভি কুসুমরাশি স্তবকে স্তবকে ফুটিয়া বিরলনক্ষত্র আকাশের দিকে চাহিয়া রূপের গরিমায় অহঙ্কার করিত, অপ্সরাগণ বৃক্ষশাখায় ভর দিয়া একবার আকাশের তারাগুলির দিকে, একবার এই মুকুলিত কুসুমরাশির প্রতি চাহিয়া এই রূপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিত ও মিটি মিটি হাসিত; সেই মধুর হাস্যে ধরাতলেও জ্যোৎস্নারাশির সৃষ্টি হইত!
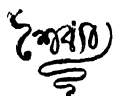
এইরূপে এই তপোবনে তাহাদের অভিশপ্ত দিন-গুলিও কি এক মধুর বিস্মৃতি ও মোহের ক্রোড়ে বিলীন হইয়া যাইত !

৩)

এইরূপে অনেক দিন গেল। সুখে দুঃখে দিন যায়, দিন থাকে না। আবার সে দিনগুলি যখন মোহের ক্রোড়ে কাটিয়া যায়, তখন আরও সত্বর যায়। ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি দিন গেল। এতদিন বিশ্বামিত্র ঋষি হিমালয়ের কোনও নিভৃত কন্দরে গুরুতর যোগসাধনায় লিপ্ত ছিলেন, এইবার অনেক দিন পরে একবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

আশ্রমে আসিয়া ঋষিবর চমকিত হইলেন। তিনি এমন ব্যাপার আর কখনও দেখেন নাই। দেখিলেন—স্বভাবের একমাত্র রচিত তপোবনের সে অপূর্ব্ব শোভা

আর নাই—তাহার উপর কৃত্রিমতার সংস্পর্শ হইয়াছে! এতদিন তাঁহার যে রাজ্যখানি দক্ষ শিল্পী প্রকৃতির একাধিপত্যে সজ্জিত হইত, তাহা এখন কাহার হস্তস্পর্শে স্থানে স্থানে ভগ্নসৌন্দর্য্য হইয়া গিয়াছে! দেখিলেন—সে কোকিলকুল আর সেখানে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে ডাকিয়া আনন্দ প্রকাশ করে না, তাহাদের মধ্যে ভীতি ও ক্রূরতা দেখা দিয়াছে; পুষ্পিত লতিকাগুলি আর এখন স্বেচ্ছা-চালিত হইয়া যথা তথা অঙ্গ বিস্তার করে না, কাহার হস্তস্পর্শে তাহারা বৃক্ষকাণ্ডচ্যুত হইয়া মাঝে মাঝে ভূমি চুম্বন করিতেছে; মুক্তাভরণ নবঘনশ্যাম দূর্ব্বাদলগুলি আর শিশিরসিক্ত হইয়া অসঙ্কোচে শির উন্নত করিয়া আকাশচুম্বন-প্রয়াসী হয় না, কে তাহাদের অগ্রভাগগুলি চরণে দলিত করিয়া রাখিয়াছে।

দেখিয়া ঋষিবরের চক্ষু বিস্ফারিত হইল। একেই কোপনস্বভাব, তাহাতে আবার আশ্রমের এতাদৃশ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তে তিনি ধ্যানস্থ হইয়া ব্যাপারখানা

কি অবগত হইলেন ; আর অমনি ভীষণ অভিসম্পাত করিয়া বসিলেন। বলিলেন,—"বটে ! এত স্পর্দ্ধা তোমাদের ? আমার তপোবনের শান্তি ভঙ্গ করিতে দ্বিধা বোধ কর না ! এই অহঙ্কারে তোমরা অচিরে নিপাত যাইবে. পুনরায় এই তপোবনের বৃক্ষরাজিতে হস্তক্ষেপ করিলেই তোমাদের সর্ব্বাঙ্গে বিষম নিগড় স্থাপিত হইবে, অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে তোমাদের শত চেষ্টায়ও আর সে নিগড় ছিন্ন হইবে না। যে বৃক্ষলতিকাকে তোমরা এত নৃশংসভাবে ছিন্ন করিয়াছ, তোমাদের অসার দেহের উপর তাহাদেরই পূর্ণ প্রভাব বিস্তৃত হইবে।"

ঋষিবর এই বলিয়া রাগে গর্‌গর্ করিতে করিতে আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পুনঃ চলিয়া গেলেন।

অপ্সরারা সেই সময় কোনও সুদূর কুঞ্জে বসিয়া স্তব্ধ হইয়া ভ্রমর-গুঞ্জন শুনিতেছিল—সুতরাং ঋষিবরের এ কঠোর শাপ শুনিতে পাইল না।

(৪)

সেদিন ক্রমে অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যা-সমাগমে অপ্সারারা চিরপ্রথামত আবার হাসিয়া উঠিল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে; জ্যোৎস্নারাশি আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া পুষ্পগুচ্ছের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে—তাহাতে অপূর্ব্ব হাসিরাশির সৃষ্টি হইয়াছে! সে হাসিরাশি অঙ্গে মাখিবার জন্য তাহাদের প্রাণ আইঢাই করিতে লাগিল। তাহারা হাসিয়া হাসিয়া সেই দিকে গেল—যেমন নিত্য যায়, সেইরূপ গেল। কিন্তু সেই প্রস্ফুটিত কুসুমস্তবকগুলি স্পর্শ করিতেই—একি
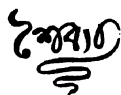
বিভ্রাট ! অকস্মাৎ কোথা হইতে অসংখ্য দুরন্ত লতিকা আসিয়া তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জড়াইয়া ধরিল। তাহারা আর শত চেষ্টা করিয়াও আপনাদিগকে মুক্ত করিতে পারিল না। যে যেখানে যে ভাবে ছিল, সে সেই ভাবেই সেখানে আবদ্ধ হইয়া রহিল।

এক-পল দু'পল করিয়া সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল, তাহাদের নিগড় ছিন্ন হইল না। এক-যাম দু'যাম করিয়া রাত্রি অনেকখানি হইল, তাহাদের নিগড় তদ্রূপই রহিল। ক্রমে নিশানাথ পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িলেন, তাহাদের বন্ধন টুটিল না—যেমন তেমনি রহিল। ক্রমে চন্দ্র অস্ত গেলেন, তারকাগুলি মিটিমিটি করিয়া জ্বলিয়া উষার কোলে মিলাইয়া যাইতে চাহিল—লতিকাগুলি তেমনি দুরন্ত, তেমনি সুদৃঢ় রহিল ! ব্যাপার দেখিয়া বন্দীরা চীৎকার আরম্ভ করিল।

দিনমণি উদিত হইয়াছেন, পূর্ব্বাকাশ অপূর্ব্ব রক্তিম-রাগে উদ্ভাসিত হইয়াছে, বিহঙ্গমকুল বৃক্ষশাখায় বসিয়া কলকণ্ঠে গীতধ্বনি করিতেছে, সরোবরে পদ্মগুলি

প্রস্ফুটিত হইয়া মধুর হাসিতেছে ও হাওয়ার তালে তালে নাচিতেছে। বন্দীগণ প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল,—কে কোথায় আছ রক্ষা কর, মায়াবদ্ধ হইয়া জঠরানলে পাঁচটী বালিকা দগ্ধ হইতেছি, কেহ আসিয়া মুক্ত করিয়া দাও।"

সেই নিবিড় কানন-পরিবেষ্টিত আশ্রমে কে তাহাদিগের চীৎকার শুনিতে পাইবে? কিন্তু বিধাতার লিপি, অকস্মাৎ কোথা হইতে তথায় এক অপরূপ যোদ্ধৃ-পুরুষ উপস্থিত হইলেন। সেই পুরুষের মুকুটের অপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্যে চারিদিক প্রভাময় হইয়া উঠিল। প্রভাত-সূর্য্যের স্বর্ণচ্ছটাও যেন সেই ঔজ্জ্বল্যের নিকট পরাজয় মানিয়াছে! যোদ্ধৃপুরুষের অঙ্গে বহুমূল্য মৃগয়া-পরিচ্ছদ, হস্তে ধনুর্ব্বাণ ও কটিতে রত্নমণ্ডিত কোষাবৃত তরবারি।

যোদ্ধৃপুরুষ শশব্যস্তে তাহাদের নিকটে আসিয়া বলিলেন,—"কে তোমরা? কেন চীৎকার করিতেছ? এ কি? তোমাদের হস্তপদে এ লতা-বন্ধন কেন?"

অপ্সরারা উৎকণ্ঠিত মনে দ্রুত কহিল,—"মহাশয়, আপনি যে হউন, আমাদের মুক্ত করুন ; আমরা বড় বিপদে পড়িয়াছি, এ বন্ধন আমরা কিছুতেই ছিন্ন করিতে পারিতেছি না। মুক্ত হইয়া সবিশেষ পরিচয় দিব।"

তাহাদের বাক্য সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই যোদ্ধা তাঁহার তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া লতাবন্ধনগুলি কাটিতে লাগিলেন। এতক্ষণ যে বন্ধন তাহাদের শত সহস্র চেষ্টায়ও ছেদিত হয় নাই, সেগুলি এখন এই পুরুষসিংহের তরবারি-স্পর্শে অতি সহজে, অতি অল্প চেষ্টায়ই কর্ত্তিত হইয়া গেল! অপ্সরারা বিস্ময়ে স্তব্ধ ও বিস্ফারিতনেত্র হইয়া রহিল।

সেই মুহূর্ত্তে আর একটা অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল!

হঠাৎ আকাশের এক প্রান্ত অপূর্ব্ব লোহিত আভায় দীপ্ত হইয়া উঠিল। সেই লোহিত আভার মধ্য হইতে একখানি অপূর্ব্ব সুন্দর রথ কোথা হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতে লাগিল।

যোদ্ধৃপুরুষ সেই দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া

রহিলেন। অপ্সরাগণও সেই দিকে চাহিল। অকস্মাৎ তাহাদের মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। বিস্ময় ও মলিনতার পরিবর্ত্তে পঞ্চ সখীর সুন্দর বদনমণ্ডলগুলি একটা মুক্তি ও আনন্দ সম্ভাবনার ছটায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

এবার যোদ্ধৃপুরুষ বিস্মিত হইলেন। সেই অপূর্ব্ব রথ আকাশ হইতে ধীরে ধীরে অবনীতে নামিয়া আসিয়াছে, আসিয়া সেই উপবনে বন্দীভূতা অপ্সরাদের নিকটে দাঁড়াইয়াছে। রথের শোভা অপূর্ব্ব! নানা স্বর্গীয় পুষ্প, পতাকা ও গন্ধদ্রব্য উহার অঙ্গের শোভা বর্দ্ধিত করিয়াছে। দেববালাগণ রশ্মি ধারণ করিয়া উত্তম উত্তম তুরঙ্গমের সাহায্যে সে অপূর্ব্ব যান চালিত করিতেছেন। রথের মধ্যে অপূর্ব্ব দিব্য আসন বিস্তৃত।

অপ্সরাগণ বিনাবাক্যব্যয়ে হাসিমুখে চিরপরিচিতের মত যাইয়া রথারোহণপূর্ব্বক সেই দেববালাদিগকে আলিঙ্গন করিল। রথ পুনঃ ভূলোক ছাড়িয়া আকাশে উত্থিত হইল।
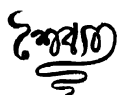
অপ্সরাগণ রথ হইতে দেখিল,—নীচে, সেই উপবনে, তাহাদের পদতলে দাঁড়াইয়া সেই যোদ্ধ্ পুরুষ! —তেমনি বিস্মিতনয়নে তাহাদের দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁহার মুখে বাক্য নাই, নয়নে নিমেষ নাই, হস্ত তরবারির উপর স্থাপিত, উন্মুক্ত অসি তখনও সম্পূর্ণ কোষবদ্ধ হয় নাই, অর্দ্ধেক ঢুকিয়াই স্তব্ধ যোদ্ধার করে স্তব্ধ হইয়া আছে।

তাহারা কতকগুলি পারিজাতগুচ্ছ রথের অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অঞ্জলি পূরিয়া তাঁহার উপর ফেলিয়া দিল, আর বলিল,—"হে মহাপুরুষ, বিস্ময় অপনোদন কর। আমরা অপ্সরা, শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্তে গিয়াছিলাম, তোমার পবিত্র দেহের স্পর্শে পুনঃ মুক্তি পাইয়াছি। আমাদের বরে তোমার যশ. কীর্ত্তি এ জগতে অক্ষুণ্ণ রহিবে। প্রাণান্তেও কখনও ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিও না।"

বলিতে বলিতে অপ্সরারা মেঘের কোলে অদৃশ্য হইয়া গেল। সেই রক্তিম আভা তাহাদের অস্তিত্বকে

আপনার মধ্যে লুপ্ত করিয়া দিয়া পরিশেষে আপন অস্তিত্বটুকুও লুপ্ত করিল।

বিস্মিত স্তব্ধ যোদ্ধৃপুরুষও তখন ধীরে ধীরে উপবন-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া আপন গন্তব্যাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

যে দিন এই ঘটনা ঘটিল, তাহার কিয়দ্দিন পরে আবার বিশ্বামিত্র ঋষি সেই তপোবনে বিশ্রামোপভোগ করিতে আসিলেন।

পথে তপোবনের কথা চিন্তা করিতে তাঁহার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল,—সেই দিন তিনি অভিসম্পাত-প্রয়োগে কয়েকটী দুঃসাহসিনা রমণীর বন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন। সেই দুর্বুদ্ধি রমণীদের কথা মনে হইতেই তাঁহার সর্ব্ব-শরীর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আজ সাক্ষাৎ হইলে কিরূপে তাহাদিগকে তিরস্কার করিবেন, কিরূপে অপদস্থ করিবেন—ঋষিবর ক্রমাগত সেই কথাই চিন্তা

করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপোবনে এতাদৃশ অত্যাচার !—বিশ্বামিত্র ভাবিয়া পাইলেন না, কিরূপ আচরণ করিলে সেই দুর্ব্বৃত্তদের উপযুক্ত শাস্তি হয়। তাঁহার প্রতি পাদবিক্ষেপে, প্রতি অঙ্গচালনায়, প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির একটা উৎকট ভাব বিকসিত হইতে লাগিল।

ঋষিবর আশ্রমে পৌঁছিলেন, দ্রুত সেই লতামণ্ডপের দিকে গেলেন, দেখিলেন কারো সাড়া-শব্দ নাই। দ্রুত মণ্ডপ-প্রবিষ্ট হইলেন, কেহ সেখানে নাই! এদিক্ সেদিক্, কুঞ্জে, বৃক্ষান্তরালে, মৃত্তিকাস্তূপশিখরে, সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিলেন, কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না! তাঁহার চক্ষু বিস্ময়-বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তবে কি তাঁহার ব্রহ্মতেজ, তপস্যাসম্বল এত দিনে লুপ্ত হইল! ঋষিবর চঞ্চল হইলেন।

অকস্মাৎ দূরে ছিন্ন লতাবন্ধনগুলির দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি দৌড়িয়া সেই দিকে গেলেন! আগ্রহাতিশয়ে দ্রুত সেই ছিন্ন বন্ধনগুলি দু'হাতে
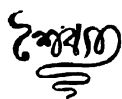
জড়াইয়া ধরিয়া তুলিলেন। কি দেখিতে পাইলেন? —যাহা দেখিতে চাহিয়াছিলেন! দেখিলেন, লতাবন্ধন —কাহার অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। বুঝিলেন, তাঁহার তপস্যা-প্রভাব লুপ্ত হয় নাই; অপ্সরারা আবদ্ধ হইয়াছিল,—কোন্ দুর্ব্বৃত্ত তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে! অগ্নিতে দ্বিগুণ ঘৃতাহুতি পড়িল! আবার কোন্ পতঙ্গ তাঁহার এ ক্রোধ-বহ্নিতে স্বেচ্ছা-চালিত হইয়া আপনাকে বিনষ্ট করিতে আসিয়াছে?

ঋষিবর আবার ধ্যানমগ্ন হইলেন। ধ্যানাবসানে এক রোষ-কষায়িত প্রতিহিংসা-উত্তেজিত দীপ্ত প্রতি-মূর্ত্তি লইয়া উঠিলেন। সে নিবিড় কাননে তখন কেউ তাঁহার সে জ্বলন্ত মূর্ত্তির দিকে তাকাইবার ছিল না; থাকিলে বোধ হয়, সেই মূহূর্ত্তে পুড়িয়া মরিত! ঋষিবর সেই মূর্ত্তি লইয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অযোধ্যাভিমুখে দ্রুত চলিলেন।

তপোবনের তরুলতাগুলি সেই দ্রুত প্রস্থানে সমীরণান্দোলিত হইয়া ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল!

বিশ্বামিত্রের ক্রোধ

সম্পদে-বিপদে ।

শৈব্যা।

—:*:—

সম্পদে-বিপদে।

(১)
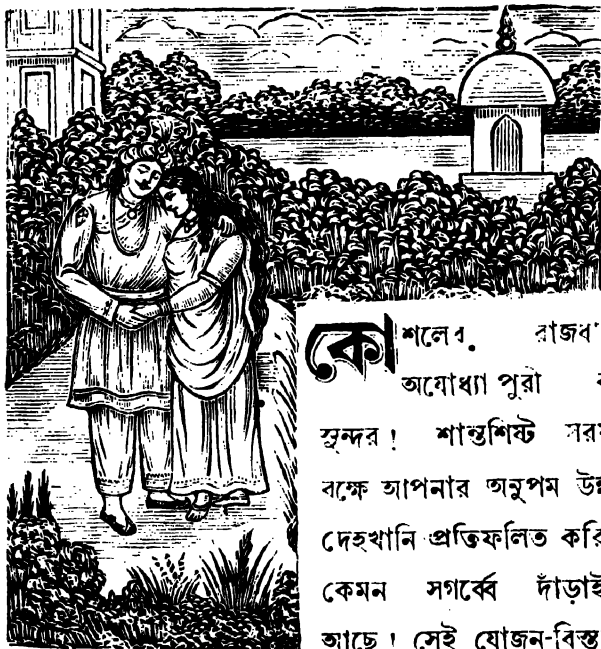
কোশলের রাজধানী অযোধ্যা পুরী বড় সুন্দর! শান্তশিষ্ট সরযূর বক্ষে আপনার অনুপম উন্নত দেহখানি প্রতিফলিত করিয়া কেমন সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে! সেই যোজন-বিস্তৃতা

নগরীর চারিধারে উন্নত প্রাচার ; প্রাচীরের তিন দিকে পরিখা, এক দিকে প্রশান্তবক্ষা সরযূ নদী কুলকুল-নাদে মৃদুমন্দ বহিয়া যাইতেছে।

প্রাচীরের উপরে শত শত পতাকা উড়িতেছে। পতাকাবলার পশ্চাতে নানা বর্ণের বিচিত্র বিচিত্র অট্টালিকা ;—উহাদের উপরে মন্দির, মঠ ও রাজ-প্রাসাদের অগণিত চূড়াগুলি নীলাকাশের গায় চিত্রার্পিতবৎ শোভা পাইতেছে !

নিম্নে নগরীর বক্ষে অসংখ্য সুপ্রশস্ত রাজপথ। সেই রাজপথগুলির দুই ধারে উত্তম উত্তম দীপাধার-শ্রেণী। অপূর্ব্ব পিত্তলাধারে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব গন্ধ-প্রদীপ প্রতি নিশায় রাজপথ আলোকিত করে ! সহস্র সহস্র নগরপাল সেই সকল পথে ভ্রমিয়া মুক্ত অসি ও মুদ্গর হস্তে সর্ব্বদা দ্বারে দ্বারে প্রহরা দেয়।

নগরীর ঠিক মধ্যস্থলে—রাজপ্রাসাদ। রাজ-প্রাসাদ, না অমরাপুরী ! তেমন বিরাট, তেমন অপূর্ব্ব-শোভা-সৌন্দর্য্যশালী মনোরম প্রাসাদ বুঝি ভূলোকে

আর কোথাও নাই! অট্টালিকার পর অট্টালিকা, আঙ্গিনার পর আঙ্গিনা, উপবনের পর উপবন, সরোবরের পর সরোবর,—কত পুরী, কত দেবালয়, কত রঙ্গালয় সেই বিস্তৃত রাজাবাসের চারু অঙ্গ শোভিত করিয়া আছে, কে তাহার সংখ্যা করে!

সেই পুরীর কক্ষে কক্ষে, প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে, অসংখ্য পুরবাসী, ভৃত্য ও সেবক-সেবিকা বিরাজ করিতেছে। কেহ গৃহকর্ম্ম করিতেছে, কেহ পুরী সজ্জিত করিতেছে,—কেহ আমোদ-প্রমোদ করিতেছে, কেহ কেহ বা কত রাজ্যের, দেশের গল্প-গুজব জুড়িয়া দিয়াছে।

পুরদ্বারে সুন্দর, উচ্চ, বিরাট নহবৎখানা। প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় তথায় সুমধুর রবে মঙ্গল-সঙ্গীত উচ্চ ধ্বনিত হইয়া উঠে, পুরাভ্যন্তর হইতে তখন শতকণ্ঠে উলুধ্বনি উত্থিত হইয়া সে অপূর্ব্ব ধ্বনির সহিত যোগ দেয়, মন্দিরের প্রাঙ্গণগুলি হইতে সুমধুর বেদ-ধ্বনিও তখন আকাশ স্পর্শ করিয়া অমৃতস্রোতের

মত সেই মঙ্গল-নিনাদকে আসিয়া আলিঙ্গন করে, তখন তাহাতে চারিদিকে কি অপূর্ব্ব-মাধুর্য্যেরই সমাবেশ হয়!

প্রাসাদের পশ্চাতে পুরাঙ্গনাগণের পবিত্র মহল। এ পবিত্র মহলের কুত্রাপি তুলনা নাই। কি সুন্দর মন্দির, কি সুন্দর পথ-ঘাট ও সরোবরাদি এই স্থানের শোভা বর্দ্ধিত করিয়াছে। সরোবরের অসংখ্য প্রস্ফুটিত পদ্ম, উপবনের সদ্য:-মুকুলিত সুরভি কুসুমরাশি, মন্দির-গাত্রে গ্রথিত শত-সহস্র উজ্জ্বল হীরকখণ্ড এই স্থানটীকে দীপ্তিময় করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু সেখানকার সকল শোভার উপরে শ্রেষ্ঠ শোভা—অপূর্ব্ব-অপূর্ব্ব ললনাকুসুম! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ-সুন্দরীরা সেই পুরীতে আপনাদিগের রূপের শিখা প্রজ্বলিত করিতে আসিয়াছে! কত রাজ্যের, কত দেশের কত সুন্দরী যে, সেখানে প্রাসাদের শোভা-বর্দ্ধন করিতে আসিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সেই রমণীকুলের মধ্যে একজন আবার অতি শ্রেষ্ঠা! তাঁহার তুলনা বুঝি দেবলোকেও নাই।

কাজলের মত ভ্রূ, তিলফুলের মত নাসা, পদ্মের পাবড়ির মত আকর্ণ-বিস্তৃত চক্ষু—তাঁহার রূপের প্রভায় সমস্ত পুরীটা হাসিয়া উঠিয়াছে!

কিন্তু যাঁহার প্রভায় সকলে হাসিতেছে, তাঁহার মুখে আজ হাসি নাই কেন?

শৈব্যা আজ কি ভাবিতেছেন? শৈব্যা তো এত গম্ভীরা নন! শৈব্যা মুখরা, বাক্‌পটু, ব্যঙ্গময়ী, রহস্যময়ী, কথায় কথায় অভিমানিনী—সেই শৈব্যা আজ এত চিন্তিতা—ইহার কারণ কি?

আজ কয় দিন হইল, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র রাজধানীতে নাই—শৈব্যার মনে সুখ নাই। যাঁহাকে এক দণ্ড সম্মুখে না দেখিলে শৈব্যা পৃথিবী অন্ধকার দেখেন, সেই স্বামী আজ কয়দিন হইল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছেন—শৈব্যার মুখে হাসির রেখা মিলাইয়া গিয়াছে।

হরিশ্চন্দ্র কোথায় গিয়াছেন? সে কথা শৈব্যার

অজ্ঞাত নয়। হরিশ্চন্দ্র শৈব্যারই জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আজ পক্ষকাল হইল, শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রকে ধরিয়াছেন—"মহারাজ, রোহিতাশ্বের জন্য একটী সুন্দর হরিণ-শাবক সংগ্রহ করিতে হইবে। পুচ্ছে তার সুবর্ণচ্ছটা, গাত্রে তার অসংখ্য তারকা-চিহ্ন থাকা চাই।" হরিশ্চন্দ্র সেই জন্য বনে গিয়াছেন। এখনও ফিরিয়া আসেন নাই। শৈব্যা ভাবিতেছেন, "কেন আসিলেন না? এত বিলম্ব তো তাঁহার কখনো হয় না। মৃগয়া করিতে যাইয়া কোনরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হন নাই তো! হায়, কেন তাঁহাকে বনে পাঠাইলাম! কেন এমন হরিণ চাহিলাম!"

উপবনের মধ্যে কুমুদ-কহ্লার-শোভিত অপূর্ব্ব সরোবর, সরোবরের তীরে নানাজাতীয় সুরভি-কুসুমের গাছ, তাহার পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া মর্ম্মরপ্রস্তর-মণ্ডিত অপূর্ব্ব পথ সরোবরের পাষাণ-নির্ম্মিত ঘাটের সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছে! সেই ঘাটের উপর বসিয়া শৈব্যা ভাবিতেছেন।

শৈব্যার স্তব্ধ নয়নের দৃষ্টি সরোবরের একটী পদ্ম-কোরকের উপর স্থাপিত ; কিন্তু সে দৃষ্টি তখন ধারণা-শক্তি হারাইয়া বসিয়াছে, শৈব্যার হৃদয়ে তখন মনশ্চক্ষু বিকসিত হইয়া তাঁহার হৃদয়স্থিত দ্বন্দ্ব দেখিতেছে—বাহিরের জগৎ তখন তাঁহার নিকট একবারে লুপ্ত।

শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রের সহিত কথায় কথায় অভিমান করেন, কথায় কথায় ব্যঙ্গ করেন, কথায় কথায় তাঁহার নিকটে নানা অদ্ভুত আব্দার করেন। তাই শৈব্যা সে দিন তাঁহার নিকটে তেমন অদ্ভুত হরিণ চাহিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্র কি তাঁহাকে ভুল বুঝিলেন ? হরিশ্চন্দ্র মাঝে মাঝে পত্নীকে তেমন ভুল বোঝেন ; তাঁহার বিমর্ষ বদন, চঞ্চল ভাবভঙ্গী, কাতর নয়নযুগল দেখিয়া শৈব্যা তাহা বুঝিতে পারেন, শৈব্যা লুকাইয়া লুকাইয়া তখন হাসেন, কিন্তু আজ তো তাঁহার হাসি পাইতেছে না। আজ নানা উদ্বেগে ও সন্দেহে তাঁহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিতেছে কেন ? হায়, কে আজ তাঁহাকে স্বামীর নিরাপদ সংবাদ আনিয়া দিবে !

শৈব্যা এইরূপ ভাবিতেছেন, অদূরে বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কে এক জন তাঁহাকে লুকাইয়া দেখিতেছে।

যিনি দেখিতেছেন, তিনি পুরুষ। তাঁহার অঙ্গে রাজবেশ, কটীতে তরবারি, হস্তে ধনুর্ব্বাণ।

বীরপুরুষ অনিমেষ নয়নে সে সৌন্দর্য্যরাশি দেখিতেছেন, দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া যাইতেছেন! তাঁহার মুখে আনন্দরাশির উপরে একটী গভীর বিস্ময়ের রেখা অঙ্কিত হইয়াছে। বীরপুরুষের চক্ষে এ দৃশ্য আজ বড় নূতন!

বীরপুরুষ সেই বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই স্তব্ধ মূর্ত্তি দেখিলেন; তার পর ধীরে ধীরে সতর্কপাদবিক্ষেপে শৈব্যার দিকে অগ্রসর হইলেন।

শৈব্যা আজ ক্ষুদ্র কুসুমকোরকটীর ভিতর এত কি দেখিতেছেন? যে শৈব্যার চঞ্চল দৃষ্টি সামান্য বৃক্ষপত্রটীর পতনেও চারিদিকে সঞ্চালিত হইয়া থাকে, সে

শৈব্যা আজ কি এক গভীরভাবে আবিষ্ট হইয়া পশ্চাতে মনুষ্য-সমাগমও উপলব্ধি করিতে পারিলেন না !

বীরপুরুষ আবার কতক্ষণ সেই নিশ্চল প্রতিমার পশ্চাতে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে ডাকিলেন,—"শৈব্যা !"

হঠাৎ শৈব্যার চমক ভাঙ্গিল! উপলখণ্ডরুদ্ধ প্রস্রবণ যেন একটী সামান্য প্রস্তরখণ্ডের স্থান-পরিবর্ত্তনে একবারে সমস্ত নিস্তব্ধতা পরিত্যাগ করিয়া হঠাৎ চঞ্চল গতিতে বহিল ! শৈব্যা দ্রুত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এক মুহূর্ত্তে তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে সমস্ত বিষাদচিহ্ন কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল ! একটা প্রফুল্লতা ও দুর্দ্দমনীয় আনন্দের প্রভা তাঁহার সমস্ত আকৃতিতে ছড়াইয়া পড়িল। শৈব্যা দেখিলেন—সম্মুখে হরিশ্চন্দ্র !

হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন, যে শৈব্যা, আবার সেই হইয়াছেন ! আবেগপূর্ণ অন্তরে তাঁহাকে বিশাল ভুজদ্বয়ে আবদ্ধ করিয়া কহিলেন,—প্রিয়তমে, ক্ষুদ্র পদ্মকোরকটীর
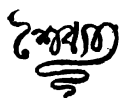
ভিতরে আবিষ্ট হইয়া এতক্ষণ এত কি দেখিতেছিলে ? আমি কতক্ষণ তোমায় লুকাইয়া লুকাইয়া দেখিতেছি। তোমার এমন বিমর্ষ ভাব তো আর কখনও দেখি নাই !”

হরিশ্চন্দ্র লুকাইয়া লুকাইয়া শৈব্যার সকল প্রেমের গুপ্ত অভিনয় দর্শন করিয়াছেন—ভাবিয়া শৈব্যা বড় লজ্জিতা হইলেন। বলিলেন—“তুমি এইরূপই বট—লুকাইয়া লুকাইয়া অপরের সম্পত্তির সন্ধান লও—পরে অবসর বুঝিয়া তাহার সর্ব্বস্ব চুরি কর। কবে আমারও সর্ব্বনাশ করিবে !”

হরিশ্চন্দ্র কহিলেন,“আমাকে সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিতে কি তোমার এত আপত্তি, শৈব্যা ? শৈব্যা, আমি তোমার কে ?”

শৈব্যা মনে মনে বলিলেন, “দেবতা, সর্ব্বস্ব, একমাত্র কণ্ঠহার !”

প্রকাশ্যে কহিলেন, “যে হও, কে সাধ করিয়া আপন বস্তু অপরকে বিলাইয়া দিতে চায়, প্রভু ?”

অপরকে! সর্ব্বনাশ! হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার পর? হরিশ্চন্দ্র প্রিয়তমার মুখে এমন কথা আর এক দিনও শোনেন নাই—এ কি শৈব্যার আন্তরিক কথা? তিনি পত্নীর উজ্জ্বল মূর্ত্তির প্রতি ম্লান দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। শৈব্যা মৃদু-মধুর হাসিতে লাগিলেন।

হঠাৎ শৈব্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, আমার হরিণশাবক কৈ? রোহিতাশ্বের জন্য হরিণশাবক আনিয়াছ তো? ... আদর দিয়া আজ আমায় সে কথা ভুলাইতে আসিয়াছ? তুমি কখন মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে?"

হরিশ্চন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল। অনেক চেষ্টাযত্ন করিয়াও তিনি মহিষার জন্য তেমন একটী হরিণশাবক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। ভাবিলেন,—সর্ব্বনাশ! না জানি এখনি কি বিভ্রাট ঘটিবে!

হরিশ্চন্দ্র ম্লান মুখে কহিলেন, "শৈব্যা, তেমন হরিণ-শাবক তো ভারতের কোথাও নাই, থাকিলে হরিশ্চন্দ্রের নয়নে নিশ্চিত পতিত হইত। আমি পক্ষকাল
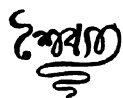
শুধু উহারই অনুসন্ধান করিয়াছি। আমায় অপরাধী ভাবিও না।”

শৈব্যা কৌতুক ও অভিমান-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—“বুঝেছি মহারাজ, তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি। তোমায় দোষ দিয়া কি হইবে?—সকলই আমার অদৃষ্ট! মহারাজ, এ রাজভাণ্ডারে সকলেরই সকল আছে, শুধু আমার প্রার্থনীয়ই নাই!—তুমি যাও।”

শৈব্যা মস্তক ফিরাইলেন। দেখিলেন, সখী মালিকা নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। শৈব্যা তাহাকে কহিলেন, “সখি মালিকে, শোন শোন, আমার এ সামান্য প্রার্থনাটীও মহারাজ রক্ষা করিলেন না—কি বলিতেছেন, শোন! আমার মরণই ভাল।”

হরিশ্চন্দ্র ব্যথিত হইলেন। কহিলেন, “শৈব্যা, তুমি আমায় বিশ্বাস করিলে না? আমি আর কি বলিব! আমি তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানি না।”

শৈব্যার অবাধ্য অন্তর পুলকে নাচিয়া উঠিল! কিন্তু তবু শৈব্যা ধরা দিলেন না।

শৈব্যা আকাশের দিকে চাহিলেন। সেই সময় রাজ-প্রাসাদের তোরণমঞ্চে হঠাৎ সান্ধ্য সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল, রাজপুরীর প্রতি গৃহ হইতে উলুধ্বনি উঠিল, দেবালয়ে দেবালয়ে কাঁসর ও শঙ্খ ঘন ঘন নিনাদ করিল।

শৈব্যা কহিলেন, "ওই দেবালয়ের আরতি-ধ্বনি আকাশ ছাইয়া উঠিতেছে! মালিকে, তুমি সাঁজের প্রদীপ জ্বালিয়া আন। দেবতার চরণদর্শনে আজ এই মনের ক্ষোভ মিটাইব।"

মালিকা শৈব্যার আদেশানুসারে অন্তঃপুরাভিমুখে চলিল। শৈব্যাও তাহার অনুসরণ করিলেন।

যাইবার সময় স্তব্ধ হরিশ্চন্দ্রের উপরে শৈব্যা একটী কুটিল বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেলেন।

শৈব্যা এতক্ষণ যে অভিমানের পালা গাহিয়া গেলেন, এই এক দৃষ্টিতেই তাহার মূলচ্ছেদ হইয়া গেল!

হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন, সে দৃষ্টিতে অজস্র প্রেম, অজস্র করুণা ক্ষরিত হইতেছে!

হরিশ্চন্দ্র উন্মত্তের মত শৈব্যাকে ধরিতে গেলেন

মৃদু হাসিয়া শৈব্যা দৌড়িয়া পলাইলেন

(২)

শৈব্যা চলিয়া গেলেন, হরিশ্চন্দ্র কতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া সেই খানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। একি হাসি! একি অভিমান! শৈব্যা দিনের দিন একি হইতেছেন! সেই প্রথম মিলনের শত অর্থপূর্ণ, গভীর প্রেমপরিপূর্ণ মধুর হাসি, এই অভিমানোত্তেজিত পলায়নের নিষ্ঠুর অত্যাচার!—কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী ছলনা? হরিশ্চন্দ্র কোন্‌টীর উপর নির্ভর করিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না।

হরিশ্চন্দ্র যে শৈব্যার হৃদয় কিছুই জানেন না, এমত নহে। শৈব্যার শত বাহ্য আবরণ সত্ত্বেও

হরিশ্চন্দ্র মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে ধরিতে পারেন, তখন সব বিস্মৃত হইয়া যান। কিন্তু সময়ে সময়ে তিনি ভ্রান্ত হন। শৈব্যার সেই প্রেমপরিপূর্ণ দৃষ্টি, সরল হাসি ও অক্লান্ত সেবা-শুশ্রূষা সত্ত্বেও, শৈব্যা রহস্যের দোহাই দিয়া অনেক সময় তাঁহাকে দূরে সরাইয়া রাখেন। কেন এরূপ করেন? হরিশ্চন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে উন্মত্ত হন, বুঝিয়াও নানা সন্দেহ করেন! বুঝি শৈব্যা তাঁহাকে তেমন ভালবাসেন না, বুঝি শৈব্যার হৃদয়ে তাঁহার জন্য ততটুকু ব্যাকুলতা নাই। তবে আর এ সংসারে বাঁচিয়া সুখ কি? শৈব্যাকে না পাইলে সব অসার!

হরিশ্চন্দ্র আবার ভাবেন,—কিন্তু আগে তো এরূপ ছিল না! সেই সুখের বিবাহ-রজনীর কথা মনে পড়ে! সেই বিবাহের অব্যবহিত পরের সুখের মিলনমধুর দিনগুলির অস্পষ্ট স্মৃতি এখনও হরিশ্চন্দ্রের মুগ্ধ হৃদয়কে শত মাধুর্য্যের ধারায় প্লাবিত করিয়া দিয়া যায়! তখন শৈব্যা কত অনুগতা ছিলেন, কত অনুরাগিণী ছিলেন। তখন শৈব্যা মিলনের

প্রলোভনে কত ছল করিতেন, কত ছলে তাঁহাকে লইয়া কত নিভৃত প্রদেশে গমন করিতেন! সে দিনগুলি আজ কোথায় গেল? সে শৈব্যা আজ কোথায়?

হরিশ্চন্দ্রের কত কথা আজ মনে পড়িতে লাগিল। অতীতের কত সুখময় চিত্র আজ—একটীর পর একটী করিয়া—তাঁহার অন্তরের উপর দিয়া শরতের মেঘের মত দ্রুত বহিয়া গেল।

ষড়্ ঋতুর সঞ্চারে কত ছলে শৈব্যা প্রিয়তমকে যে নিকটে রাখিতে চাহিতেন, সেই সব কথাগুলি একে একে এখন তাঁর মনে আসিতে লাগিল।

বসন্তকালে কোকিল ডাকিয়া উঠিত, মৃদু সমীরণ ধীরে ধীরে মলয় পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিয়া চারিদিক্ স্নিগ্ধ করিয়া দিয়া যাইত, বৃক্ষে বৃক্ষে মুঞ্জিত শাখা-প্রশাখাগুলি নবপল্লববিকাশে শ্যামলশোভা বিকীর্ণ করিত, শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রকে ধরিয়া বসিতেন, "চল মহারাজ, একবার উপবন ভ্রমণ করিয়া আসি।" হরিশ্চন্দ্র অপূর্ব্ব সুন্দর রথে তাঁহাকে উপবনে লইয়া যাইতেন।

হরিশ্চন্দ্রের সেই মধুময় দিনগুলির কথা আজ মনে পড়িল।

গ্রীষ্মে দারুণ উত্তাপ আসিয়া রাজধানীকে পীড়িত করিত, আতপতপ্ত হইয়া পাষাণনির্ম্মিত অট্টালিকাগুলি জ্বলন্ত অঙ্গারের মত চারিদিক্ সন্তাপিত করিত, শৈব্যা মহারাজকে বলিতেন—"উঃ! আর যে থাকা যায় না, চল মহারাজ, হিমালয়ের চারু শৃঙ্গে গ্রীষ্ম অপনোদন করিয়া আসি।" হরিশ্চন্দ্র সমস্ত রাজকার্য্য ফেলিয়া প্রিয়তমার সহিত ছুটিতেন।

হরিশ্চন্দ্রের আজ সেই কথা মনে পড়িল!

বর্ষায় জলপ্লাবনে চারিদিক্ ভাসিয়া যাইত, নদী বিল খাল প্রভৃতি প্রবলবেগে ছুটিত,—কূলে কূলে পরিপূর্ণা হইয়া ভরা যৌবনে উদ্দাম গতিতে সাগরাভিমুখে ধাইত, শৈব্যা আকুল হইয়া হরিশ্চন্দ্রকে ধরিতেন, "চল মহারাজ, এই সময়ে নর্ম্মদার বক্ষে জলক্রীড়া করিয়া আসি।" হরিশ্চন্দ্র অমত করিতে পারিতেন না, শত কার্য্য রাখিয়াও ছুটিয়া যাইতেন।

হরিশ্চন্দ্র আকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "হায়, সে দিনগুলি আজ কোথায় ?"

শরতে আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিত নীলাকাশে বায়ুতাড়িত মেঘখণ্ডগুলি চঞ্চল গতিতে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত—বুঝি যাইবার ইচ্ছা নাই, ধরিত্রী কি এক অপূর্ব্ব তরুণ রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিত, সূর্য্য-রশ্মিতে ও পাখীর গানে কি এক মাদকতা আসিয়া দেখা দিত, শৈব্যা তখন পুষ্পকানন আর পরিত্যাগ করিতেন না—কেবলই হরিশ্চন্দ্রের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কুসুমিত কুঞ্জে, নব দূর্ব্বাদলে পড়িয়া থাকিতেন, আর তাঁহার মুখপ্রতি চাহিয়া কি এক মধুরভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন ! তখন জ্যোৎস্না-রাশি তাঁহার মুখের উপর পড়িয়া কেবলই হাসিতে থাকিত।—কবিত্বের চরম বিকাশ হইত ! হরিশ্চন্দ্র মুগ্ধ নেত্রে কেবলই তাহা দেখিতেন ! পৃথিবার কথা আর মনে থাকিত না। শুধু শৈব্যা—শৈব্যা সেই মনটী জুড়িয়া থাকিত ! সে শৈব্যার আজ একি হইল ?

হরিশ্চন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে বসিয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার মন্দ মন্দ পবন তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট ললাট হইতে ঘর্ম্মবিন্দু চুম্বন করিয়া লইয়া গেল। আবেশে তাঁহার নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিতে লাগিল— আর ভাবিতে পারিলেন না। নিদ্রালস নয়নে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিয়া পর্য্যঙ্কে দেহ রক্ষা করিতেই সকল চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

(৩)

ব্যথিত হরিশ্চন্দ্রের কথা বলিলাম, এখন একটু শৈব্যার অন্তরের কথা বলিব। প্রথম মিলনের এত আবেগ, এত ভালবাসার পরে শৈব্যার আজ এত সঙ্কোচ, এত অভিমান কেন? এত সঙ্কোচ এত অভিমান তো ভাল নয়। কিন্তু শৈব্যাকে তোমরা অন্যথা ভাবিও না। শৈব্যা সব কথা বোঝেন, কিন্তু প্রতিকার করিতে পারেন না।

সেই প্রথম মিলনের আবেগময় দিনগুলির কথা তাঁহারও মনে উদয় হয়, তাঁহারও প্রাণ সেই দিনগুলির জন্য অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হইয়া উঠে; কিন্তু তবু শৈব্যা সে মনকে প্রাণপণ চেষ্টায় নিবৃত্ত করেন। কাহার জন্য করেন? হরিশ্চন্দ্রেরই

জন্য! হায়, হরিশ্চন্দ্র এ কথাটা বুঝেন না, বুঝিলে বোধ হয় তাঁহার এত কষ্ট থাকিত না।

যখন সেই নবপ্রণয়োন্মেষে, প্রথম মিলনে, উভয়ে উভয়কে দেখিয়া সব ভুলিয়া যাইতেন, কি এক মধুর ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন, শৈব্যা পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু,—হরিশ্চন্দ্র রাজা প্রজা শাসন সংরক্ষণ সব বিস্মৃত হইতেন, সেই সময়ে একদিন কি করিয়া শৈব্যার কাণে একটা মর্ম্মান্তিক কথা পৌঁছিয়াছিল,—শৈব্যা একদিন শুনিয়াছিলেন, প্রজারা বলে, শৈব্যার জন্য রাজ্যের অনেক ক্ষতি হয়। মহারাজ আর তেমন রাজকার্য্য দেখেন না, কেবলই পত্নীর মুখ প্রতি চাহিয়া থাকেন। সেই অবধি শৈব্যার এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

হায়, শৈব্যার জন্য শৈব্যার জীবনসর্ব্বস্বের এই কলঙ্ক-কালিমা! নারীজীবন কি এতই স্বার্থপর! নারীর কার্য্য কি এতই হেয়! শৈব্যা প্রিয়তমের গৌরবময় অঙ্গে এই কলঙ্ককালিমা লেপিয়া দিয়াছেন—শৈব্যা কি ইচ্ছা করিলে সেই প্রিয়তমকে আবার

দেবতা করিয়া তুলিতে পারেন না? সেই অবধি শৈব্যা সেই চেষ্টা করিতেছেন। প্রকাশ্যে বলিলে পাছে প্রজার উপর রাজা রুষ্ট হন, তাই শৈব্যা ছলে, কৌশলে, রহস্যের দোহাই দিয়া পতিকে আপনার মোহজাল হইতে কেবলই দূরে রাখিতেছেন। ইহাতে তাঁহাকে কতখানি স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে হইতেছে, তাহা কে বলিবে

হরিশ্চন্দ্রের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া শৈব্যা দেবালয়ে আরতি দর্শন করিতে গেলেন। আরতির পরে সাষ্টাঙ্গে দেবতাকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু শৈব্যার মনে, শৈব্যার দৃষ্টিতে তখন দেবতার প্রতিমূর্ত্তি জাগিতেছিল না, হরিশ্চন্দ্রের সেই স্তব্ধ, মলিন, প্রেমকাতর মুখখানিই অধিক জাগিতেছিল। শৈব্যা দেবতাকে প্রণাম করিতে মনে মনে স্বামীকেই প্রণাম করিলেন। তারপর উঠিয়া মালিকাকে লইয়া মন্দিরের এক প্রান্তে গেলেন।

“মালিকা বলিল, “কি সখি, আমায় টানিয়া আনিলে কেন?”

শৈব্যা কহিলেন, "তোমায় এখনই মহারাজের নিকট যাইতে হইবে। তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত, তুমি যাইয়া তাঁহার শুশ্রূষা কর। আমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে কহিও, আমি মন্দিরে মন্দিরে দেবতা দর্শনে যাইতেছি।"

মালিকা হাসিল। কহিল,—"আমার দায় পড়িয়াছে। তোমার মণি, তুমি মাজিয়া ঘষিয়া ঠিক করিয়া রাখ। আমি পারিব না।"

শৈব্যা সখীর দিকে একটিবার কুটিল বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মৃদু-মধুর হাসিয়া কহিলেন, "আমি তা পারি না। আমার হাতের দোষে, মাজিতে ঘষিতে গেলে সে মণি আরও মলিন হইয়া উঠে! তুই যা।"

মালিকা কহিল—"মণি উজ্জ্বল হউক, বা মলিন হউক, তাতে আমার কি? তোমার মণি—আমার তাতে কিছু লাভ-ক্ষতি নাই। আমি পারিব না—চলিলাম।"

মালিকা চলিয়া গেল। শৈব্যা কতক্ষণ চুপ করিয়া তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর নিজেই ধীরে ধীরে

অন্তঃপুর পানে চলিলেন। যাইতে যাইতে মৃদু মধুরকণ্ঠে গাইলেন,—

আমায় শক্তি দে মা শক্তিময়ি,
আমার প্রাণ-নদীতে বান ডেকেছে,
—তার জন্য যে আমি দায়ী!

আমার তরী খানি ডুবু ডুবু,
ও সে যে তাতে পারে যাবে গো;
আমি হা'ল রাখ্‌তে নারি,
আমার সঙ্গে যে মা সেও যাবে গো;
আমায় ধ'রে রাখিস্‌, আশীষ্‌ করিস্‌,
যেন হই মা এ যুদ্ধে জয়ী;
ওমা, আমার কি হবে মা, তার জন্য যে আমি দায়ী।

(৪)
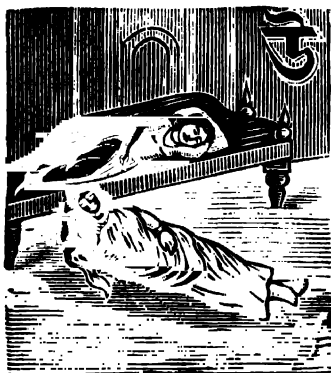
ত্তম শয়নকক্ষে উত্তম রজত পালঙ্কে পড়িয়া হরিশ্চন্দ্র অকাতরে ঘুমাইতেছেন, শৈব্যা গৃহপ্রবেশ করিয়া সেই দৃশ্য দেখিলেন।

হরিশ্চন্দ্র গভীর নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন—সন্দেহকালিমা-ম্লান ব্যথিত ললাটদেশ হইতে চিন্তার রেখা এখন অপসারিত হইয়াছে, তাহাতে মেঘমুক্ত আকাশের পূর্ণচন্দ্রমার ন্যায় হরিশ্চন্দ্রের স্বাভাবিক উজ্জ্বলকান্তি আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নীরবে দূরে দাঁড়ইয়া দাঁড়াইয়া অতৃপ্ত লোচনে,

স্তব্ধ অন্তরে শৈব্যা কতক্ষণ সেই অপূর্ব্ব কান্তি উপভোগ করিলেন। তার পর ধীরে ধীরে পালঙ্কের নিকট গেলেন।

শৈব্যা পালঙ্কে উঠিলেন না। নীচে অনাবৃত মেজেতেই বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া আপনার নানা-রত্ন-হীরকাদি-মণ্ডিত, ভ্রমর-কৃষ্ণ, কুঞ্চিত-কুঞ্চিত-দীর্ঘকেশ-গুচ্ছশোভিত মস্তকটী ভর্ত্তার-চরণযুগলে ন্যস্ত করিলেন।

তখন শৈব্যার মান, অভিমান, ক্রীড়া-কৌতুক কোথায় ভাসিয়া গেল,—শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

শৈব্যা মনের সকল শক্তি একত্র করিয়া বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া সেইরূপ অবস্থায়ই প্রিয়তমের মুখের দিকে সঙ্কুচিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িলেন।

হরিশ্চন্দ্র কিছু দেখিলেন না।

তখন তিনি স্বপ্নে ইহার একটী বিপরীত চিত্রই দেখিতেছিলেন;—সে শৈব্যার অভিমান-কুঞ্চিত মোহিনী মূর্ত্তি!

(৫)

প্রভাত হইয়াছে, সূর্য্য উঠিয়াছে, আর অন্ধকার নাই, হরিশ্চন্দ্রের মনের অন্ধকারও সেই সঙ্গে অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। শয্যাত্যাগ করিয়াই মহারাজ প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া রাজসভায় যাইয়া বসিলেন।

হরিশ্চন্দ্র বড় ধার্ম্মিক, বড় কর্ত্তব্যপরায়ণ! প্রথম যৌবনে শৈব্যার অতুলনীয় রূপ-গুণরাশি তাঁহাকে একটু বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল—এ কথা বলিয়াছি; কিন্তু পতিপ্রাণা শৈব্যার প্রাণপণ চেষ্টায়, আত্মবলিদানে সে কলঙ্কটুকুও ধুইয়া গিয়াছে। এখন হরিশ্চন্দ্রের মত ধার্ম্মিক, সত্যনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ভূপতি আর দ্বিতীয় নাই।

অযোধ্যার রাজসভা বড় সুন্দর। কত কত স্তম্ভ, কত কত চিত্র, কত কত মূর্ত্তি চারিদিকে ক্ষোদিত রহিয়াছে। স্তম্ভগুলির গাত্রে নানা চিত্র, শিরে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব অপ্সরামূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তিগুলি এক হস্ত বিস্তার করিয়া উপরের বিশাল চন্দ্রাতপটী টানিয়া রাখিয়াছে, অপর হস্তে উত্তম উত্তম প্রদীপাধার ধরিয়াছে।

সভার মধ্যস্থলে উচ্চ মর্ম্মর বেদীর উপর উজ্জ্বল রত্ন-সিংহাসন, সেই সিংহাসনে উজ্জ্বল রাজমুকুট পরিয়া মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বসিয়াছেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য রজতাসনে অযোধ্যার পাত্রমিত্রগণ উপবিষ্ট,—বৈতালিকেরা মহারাজের স্তুতিপাঠ করিতেছেন।

স্তুতিপাঠ সমাপ্ত হইলে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। কত দেশের কত কত কথা, কত কত অভিযোগ আসিয়াছে, মহারাজ একে একে তাহার মীমাংসা করিতে লাগিলেন। তখন আর তাঁহার আত্ম-সুখ-দুঃখের কথা মনে রহিল না। তখন আপনাকে ভুলিলেন, শৈব্যাকে ভুলিলেন, শৈব্যার

মানাভিমানকেও ভুলিলেন ; কেবল প্রজার সুখ-দুঃখ, রাজার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তখন তাঁহার সমস্ত হৃদয়টা জুড়িয়া বসিল। হরিশ্চন্দ্র একে একে সকল কার্য্য সমাধা করিয়া সভা ভঙ্গ করিতে উঠিলেন।

কিন্তু এমন সময় কে একজন হঠাৎ ঝড়ের মত গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার হইতে তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন।

যিনি আসিলেন, তিনি কহিলেন,—"মহারাজ! সভা ভঙ্গ করিবেন না। আর একটী গুরুতর অভি-যোগ রহিয়াছে, অগ্রে তাহার মীমাংসা করুন।"

সভাস্থ লোকেরা সবিস্ময়ে দেখিল, বাহিরের আলোককে পশ্চাতে রাখিয়া দ্বারপথে দাঁড়াইয়া এক অপূর্ব্ব জটাজূট-মণ্ডিত দীর্ঘ ঋষিমূর্ত্তি! যেন উজ্জ্বল চিত্রপটে কে একখানি বিরাট ছায়ামূর্ত্তি আঁকিয়া রাখিয়া দিয়াছে।

ঋষিমূর্ত্তি ক্ষণকাল সেইস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ক্রমে ক্রমে সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইলেন। সকলে দেখিলেন, সে মূর্ত্তি আর কাহারও নহে—স্বয়ং বিশ্বামিত্র ঋষির।

দেখিবামাত্র সকলে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। স্বয়ং মহারাজ হরিশ্চন্দ্র পাদ্যার্ঘ্য লইয়া সিংহাসন হইতে নামিলেন। পাদ্যার্ঘ্য দিতে যাইবেন, এমন সময় হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন, দেখিলেন—একি মূর্ত্তি!

সে দিন ঋষিবরের মুখ হর্ষপ্রফুল্ল নহে। মহারাজ দেখিলেন, স্বাভাবিক উদারতা ও মহানুভবতার পরিবর্ত্তে সে দিন সে মুখমণ্ডলে কি এক প্রতিহিংসার ছবি স্পষ্ট অঙ্কিত রহিয়াছে! তপশ্চরণে যে চক্ষুর্দ্বয় কি এক স্বর্গীয় স্নিগ্ধতায় সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত, আজ তাহা কি এক জিঘাংসার পীড়নে কুঞ্চিত,—কঠোর!

হরিশ্চন্দ্রকে চমকিত হইতে দেখিয়া মহর্ষি হাস্য করিলেন। কহিলেন, "রাজন্, আবশ্যক নাই, আমি পাদ্যার্ঘ্য গ্রহণ করিতে এ স্থানে আসি নাই; সে জন্য ব্যস্ত হইও না। আমি আজ তোমার নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছি। যাও, সিংহাসনে উপবেশন কর—আমার অভিযোগের বিচার কর।"
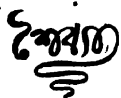
বিশ্বামিত্রের কঠোর বচনে মহারাজ আরও অধিক চমকিত হইলেন। কহিলেন, "মহর্ষি, আপনার মূর্ত্তি আজ এত চঞ্চল ও ক্রোধকম্পিত কেন? কোন্ পাষণ্ড না জানিয়া শুনিয়া মূর্খের মত আপনাকে অবজ্ঞা করিয়াছে? আপনি তাহার নাম করুন, এই মুহূর্ত্তে আমি তাহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিব। কিন্তু আমাকে পাদ্যার্ঘ্য দিতে বারণ করিবেন না। অগ্রে পাদ্যার্ঘ্য গ্রহণ করিয়া আপনি এই উচ্চ আসনে উপবেশন করুন, তারপর আমি সকল শুনিতেছি।"

হরিশ্চন্দ্র এই বলিয়া যথারীতি মহর্ষিকে সংবর্দ্ধনা পূর্ব্বক উত্তম আসনে উপবিষ্ট করাইলেন, তারপর নিজে যাইয়া পুনঃ সিংহাসনে বসিলেন।

আসনে উপবিষ্ট হইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র কহিলেন, "রাজন্, এইবার আমার অভিযোগ শ্রবণ কর। আজকাল আশ্রমে বড় অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। আজ কয়েক দিন হইল কয়েকটী অপ্সরা আমার বিধানে লতাজড়িত হইয়া তপোবনের একপার্শ্বে পড়িয়া ছিল,

কোন্ দুর্বৃত্ত যাইয়া আমার বিনা অনুজ্ঞায় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে! রাজন্, এ অপরাধের কি উপযুক্ত দণ্ড হইতে পারে!"

হরিশ্চন্দ্র চমকিত হইলেন। সর্ব্বনাশ! এ অপরাধী কে? এ অপরাধী তো আর কেহ নয়—স্বয়ং হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্রের, ব্যাপার কি বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি করযোড়ে কহিলেন, "ঋষিবর, সে অপরাধী যে স্বয়ং এ অধম! কিন্তু আপনি আমার প্রতি কিঞ্চিৎ অবিচার করিতেছেন। আমি তো তাহাদিগের বিস্তারিত অবস্থা অবগত ছিলাম না! কিরূপে জানিব যে, তাহারা আপনারই বিধানে ঐ নিগড়-যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিল। যাহা হউক, যদি এ কার্য্যে কিছু অপরাধ হইয়া থাকে, অজ্ঞানকে ক্ষমা করুন।"

বিশ্বামিত্র কুপিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন,—"অজ্ঞান! অজ্ঞানকে ক্ষমা! না রাজন্, এ কথা অন্যে বলিলে সাজিত—তোমার মুখে সাজে না। অজ্ঞান হইলে এ রাজদণ্ড তুমি গ্রহণ করিলে কেন?

অজ্ঞান হইলে এই গুরুতর দায়িত্ব তুমি এই মুহূর্ত্তেই অপর যোগ্য ব্যক্তির হস্তে অর্পণ কর—আমরা নিশ্চিন্ত হই।"

হরিশ্চন্দ্র বিনীত ভাবে কহিলেন, "ঋষিবর, ভয়ার্ত্তকে রক্ষা করিয়া আমি যে রাজধর্ম্ম কলঙ্কিত করিয়াছি, এমন বোধ হয় না। তবু যদি আমাকে অযোগ্য ব্যক্তি মনে করিয়া থাকেন, এই মুহূর্ত্তে আমাকে এই গুরুতর দায়িত্ব হইতে মুক্ত করুন, আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই।"

ঋষিবর কহিলেন—"উত্তম! তুমি রাজধর্ম্মের বড়াই করিতেছ, দানও একটা রাজধর্ম্ম বটে! তুমি এই রাজ্য আমায় দান কর। প্রস্তুত?"

হরিশ্চন্দ্র কহিলেন,—এই মুহূর্ত্তে! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহা গ্রহণ করুন—আমি এখনই উৎসর্গ করিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া হরিশ্চন্দ্র এক জন অনুচরকে মেদিনী উৎসর্গ করিবার জন্য স্বর্ণপাত্রে পূতবারি আনিতে আদেশ করিলেন। বিশ্বামিত্র অবাক্ হইয়া রহিলেন।

বিশ্বামিত্র এমন কখনও ভাবেন নাই। সূর্য্য-বংশের বংশানুক্রমে অধিকৃত কোশলের রাজসিংহাসন হরিশ্চন্দ্র এক কথায় তাঁহাকে দান করিয়া ফেলিবেন—ইহা তাঁহার কল্পনারও অতীত। তিনি ভাবিলেন—"হরিশ্চন্দ্রের অদ্ভুত প্রকৃতি! কিন্তু এ তাহার আত্মম্ভরিতা মাত্র। দানের ঘটা দেখাইয়া আত্মযশ স্ফীত করিবার জন্যই হরিশ্চন্দ্র সঞ্চয় না বুঝিয়া আজ এই দান করিতেছে। তাহার এ অহঙ্কার আমি যেমন করিয়া হউক চূর্ণ করিব।"

অনুচর পূতবারি লইয়া আসিল। হরিশ্চন্দ্র মৃত্তিকা-মুষ্টি গ্রহণ করিয়া পৃথিবী দান করিতে উদ্যত হইলেন। সভাসদেরা এতক্ষণ ব্যাপার দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া ছিলেন, এখন আর থাকিতে পারিলেন না—দ্রুত মহারাজের পার্শ্বে আসিয়া কহিলেন—"মহারাজ! কি করিতেছেন? কি করিতেছেন! অপেক্ষা করুন।"

হরিশ্চন্দ্র দৃঢ় ভাবে হস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বাধা দিয়া কহিলেন,—"চুপ কর, শুভ

কার্য্যে বাধা দিও না। আজ আমি অতি যোগ্য পাত্রে অযোধ্যার রাজ্যভার অর্পণ করিতেছি, ইহাতে আশঙ্কার কথা কিছুমাত্র নাই। মহর্ষি বিশ্বামিত্র এককালে রাজা ছিলেন, এক্ষণে তপস্বী হইয়াছেন, এইবার রাজার বীরত্ব ও তপস্বীর অন্তর্দ্দৃষ্টি তোমরা এক সঙ্গে পাইবে। এইবার তোমরা নিশ্চিন্ত হইবে।"

হরিশ্চন্দ্র সরল ভাবে এই কথাগুলি কহিলেন, কিন্তু বিশ্বামিত্র ঋষি এই কথায় ব্যঙ্গের আভাস পাইলেন। ঋষিবর মনে করিলেন, হরিশ্চন্দ্র তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্বের কথা তুলিয়া তাঁহাকে উপহাস করিতেছে মাত্র। ক্রোধে তাঁহার অন্তর আরও জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "মহারাজ, তুমি কোশলের রাজা হইলেও, সসাগরা পৃথিবীরই একচ্ছত্র অধিপতি, অন্যান্য দেশের সকল রাজগণই তোমার অধীন। তুমি তোমার সর্ব্বস্ব দান করিয়া—তবে আজ আমাকে এই সসাগরা পৃথিবীই দান করিবে?"

হরিশ্চন্দ্র বিনীত ভাবে কহিলেন,—"হাঁ প্রভু,

আমি আপনাকে সসাগরা পৃথিবীই দান করিতেছি, এই গ্রহণ করুন।”

এই বলিয়া হরিশ্চন্দ্র মন্ত্রপূত করিয়া মিশ্বামিত্রকে পৃথিবা দান করিয়া ফেলিলেন। বিশ্বামিত্র “স্বস্তি” বলিয়া সেই দান গ্রহণ করিলেন। সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নীরবে এই দৃশ্য দেখিল। দান গ্রহণ করিয়া বিশ্বামিত্র কহিলেন, “এখন আমার দক্ষিণা? দক্ষিণা ব্যতীত তো দান সিদ্ধ হয় না।”

হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, “সেজন্য চিন্তিত হইবেন না— এই মুহূর্ত্তেই দক্ষিণা দিতেছি।” এই বলিয়া তিনি একজন অনুচরকে ডাকিয়া কহিলেন, —“এখনি রাজকোষ হইতে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লইয়া আইস। বিলম্ব করিও না।”

ঋষিবর দাঁড়াইয়া উঠিলেন। অনুচরকে হস্ত সঞ্চালনে বাধা দিয়া কহিলেন, “সে কি রাজন্? আপনি কাহার ধন তাহাকে আনিতে আদেশ করিতেছেন? এই কি আপনার সসাগরা পৃথিবী দান! আপনি

আমাকে সকল পৃথিবী দান করিয়াছেন, এ পৃথিবীর কোন সামগ্রীতে তো আর আপনার অধিকার নাই।"

হরিশ্চন্দ্র স্তব্ধ ও চমকিত হইলেন। "ওঃ!" বলিয়া তিনি মস্তক অবনত করিলেন।

ঋষিবর বলিলেন, "রাজন্, নীরব রহিলেন যে? এইবার দর্প রক্ষা করুন! পৃথিবীতে স্ত্রী-পুত্র-ভিন্ন অপর কিছুতে এখন আর আপনার অধিকার নাই, এইবার কোথা হইতে কথিত সহস্র মুদ্রা দিবেন, দিন্।"

হরিশ্চন্দ্র চঞ্চল হইলেন। পৃথিবী দানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশ্বামিত্রকে সর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন, এক কপর্দ্দকও আত্মসম্বল রাখেন নাই—এতক্ষণ এতটা বুঝিতে পারেন নাই। এখন কোথা হইতে এই দক্ষিণার অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিবেন—ভাবিয়া অস্থির হইলেন।

হরিশ্চন্দ্র কাহলেন, "প্রভু, আমাকে এক পক্ষ কাল সময় দিন। এই সময়ের মধ্যে আমি যেমন করিয়া পারি আপনার ঋণ শোধ করিব, এইটুকু সময় অপেক্ষা করুন।"

বিশ্বামিত্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এইবার ক্রোধকম্পিত স্বরে গর্জ্জিয়া কহিলেন, "অন্ধ রাজন্! এই তোমার গর্ব্ব? এই গর্ব্বে তুমি স্ফীত হইয়া ধরাকে শরা জ্ঞান কর? মুনি-ঋষির আশ্রমের সম্মান রক্ষা করাও কর্ত্তব্য মনে কর না? উত্তম! আমি তোমার অনুরোধ রাখিলাম, এক পক্ষ কাল অপেক্ষা করিব। কিন্তু মনে রাখিও, এই সময় মধ্যে আমার দক্ষিণা না দিতে পারিলে সূর্য্যবংশের নিপাত নিশ্চিত! অভিশাপ প্রদানে আমি সকলকেই ভস্মীভূত করিব— একজনকেও বংশে বাতি দিতে রাখিব না। ভাব।"

হরিশ্চন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন। মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া ঋষিকে কহিলেন "প্রভু, ভাবিবার কিছু নাই, আপনার আজ্ঞাই আমার শিরোধার্য্য। আমি চলিলাম, যদি ভ্রমেও কোন অপরাধ করিয়া থাকি, নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।"

এই বলিয়া হরিশ্চন্দ্র সভা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। ঋষিবর তাঁহাকে আবার ডাকিয়া ফিরাইলেন।

কহিলেন,—"শোন, আরও এক কথা আছে। এ রাজ্য এখন আমার, কা'ল হইতে আমি এ রাজ্যের নূতন বন্দোবস্ত করিব, তোমাকেও কা'লই এ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে,—আমার রাজ্যে তোমার থাকা নিষেধ। স্ত্রী-পুত্রকে সঙ্গে লইবার জন্য আমি তোমায় একদিন মাত্র সময় দিলাম—এই সময়ের মধ্যে যাইবার বন্দোবস্ত কর।"

হরিশ্চন্দ্র চিন্তা করিলেন। এ সসাগরা পৃথিবী ছাড়িয়া তিনি এখন কোথায় যাইবেন? বিশ্বামিত্র কি তাঁহাকে ইহলোক হইতে একেবারে তাড়িত করিবার জন্যই এ ইঙ্গিত করিলেন! কিন্তু তাহা হইলে মহর্ষির ঋণ-পরিশোধের উপায় কি?

হঠাৎ হরিশ্চন্দ্রের মনে পড়িল, বারাণসী তো পৃথিবীর অন্তর্গত নয়—শিবের ত্রিশূলোপরি স্থাপিত বারাণসী পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র। হরিশ্চন্দ্র কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, "প্রভু, তবে তাই হউক্, কল্য প্রত্যূষেই আমি এ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে

প্রস্থান করিব; কাশী তো পৃথিবীর অন্তর্গত নয়—সেখানে আমার আশ্রয় মিলিবে। প্রণাম করি—আসি তবে।"

হরিশ্চন্দ্র চলিয়া গেলেন, বিশ্বামিত্র কতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর পাত্রমিত্রদিগের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন, "তোমরা এখন কি করিবে? এখন হইতে তোমরা আমার কর্ম্মচারী। আজ যাইয়া যে যার গৃহে বিশ্রাম কর। কা'ল যখন কাজের নূতন বন্দোবস্ত হইবে, আবার আসিও।"

পাত্রমিত্রদের শরীর ক্ষোভে ও রাগে জ্বলিয়া যাইতেছিল; তাঁহারা কহিলেন, "আমরাও রাত্রি প্রভাতে এ অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া যাইব। যে রাজ্যে হরি-শ্চন্দ্র নাই, তথায় আমাদেরও স্থান নাই—আপনি অন্য লোক খুঁজুন—আমাদের পাইবেন না।"

বিশ্বামিত্র তাঁহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু কেহ সে দৃষ্টির সম্মান রক্ষা করিলেন না। তাঁহারা রাজাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন—ঋষির ক্রোধটাকে অগ্রাহ্য করিয়াই যথা-তথা চলিয়া গেলেন।

(৬)

হরিশ্চন্দ্র অন্তঃপুরে আসিয়া প্রথমেই শৈব্যার গৃহের দিকে চলিলেন। এইবার তাঁহার মনে নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল।

শৈব্যার গৃহের দিকে যাইতে আজ তাঁহার পা উঠিতেছে না। তিনি তো সর্ব্বস্ব বিশ্বামিত্রকে দান করিয়া আসিয়াছেন,—তাঁহার ইহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু শৈব্যার কি হইবে? প্রিয় পুত্র রোহিতাশ্বের কি হইবে?

শৈব্যার অভিমানকুঞ্চিত মুখখানি এখন তাঁহার মনে ঘন ঘন উদিত হইতে লাগিল; রোহিতাশ্বের প্রফুল্ল, সরল সংসার-বিষবর্জ্জিত কমনীয় কান্তিখানি যেন তাঁহার সম্মুখে কেবলই নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। হরিশ্চন্দ্র

ভাবিলেন,—ইহাদের কি হইবে ? আশ্চর্য্য ! ইহাদের কথা তো আমি একবারও ভাবি নাই ! ইহাদের কোথায় রাখিয়া যাইব ?—কাহার আশ্রয়ে রাখিয়া যাইব ?

হরিশ্চন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে শৈব্যার গৃহদ্বারে আসিলেন ; তাঁহার অন্তর হঠাৎ দুর-দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু দেখিলেন, শৈব্যা তথায় নাই। শৈব্যা কোথায় গেলেন ? উপবনে গিয়াছেন কি ? হরিশ্চন্দ্র পুনঃ উপবনাভিমুখে চলিলেন।

তখন সূর্য্যদেব আকাশে অনেকখানি উঠিয়াছেন, সরোবরের জলে রশ্মি পড়িয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে তার রজত-রেখা ছড়াইয়া দিতেছে, পদ্মগুলি তরঙ্গের আঘাতে একটু একটু করিয়া নাচিতেছে। তীরে কুসুমিত লতাগুলি হইতে অপূর্ব্ব সৌরভ বহিয়া দুষ্ট সমীরণ ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। সেই সৌরভ আঘ্রাণে হরিশ্চন্দ্রের ক্লান্ত অন্তর কতকটা সুস্থির হইল।

উপবনে যাইয়া হরিশ্চন্দ্র শৈব্যাকে ইতস্ততঃ খুঁজিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পাইলেন না, বিফল-

মনোরথ হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিলেন, হঠাৎ একস্থানে রোহিতাশ্বের কোমল হাস্যধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। হরিশ্চন্দ্র দ্রুত সেই দিকে গেলেন। যাইয়া দেখিলেন, কি অপূর্ব্ব দর্শন! সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া হরিশ্চন্দ্রের চক্ষে জল আসিবার উপক্রম হইল। হায়, সে দৃশ্য আর তিনি এ পৃথিবীতে কখনও দেখিবেন কি? কে বলিয়া দিবে?

সে এক অপূর্ব্ব মধুর মাতৃমূর্ত্তি!

শৈব্যা একটী শুক-শাবক লইয়া রোহিতাশ্বকে কৌতুক দেখাইতেছেন। রোহিতাশ্ব ব্যগ্র হইয়া সেই শাবকটী ধরিতে যাইতেছে, শৈব্যা দিতেছেন না— বামহস্তে পক্ষীটীকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছেন, রোহিতাশ্ব বামহস্তে মাতার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া দক্ষিণ হস্তে তাহা কাড়িয়া আনিতে ব্যস্ত, শৈব্যার দক্ষিণ হস্ত তাহাকে নিরস্ত করিতেছে!

শুক-শাবকটীও যেন এই ক্রীড়াতে মাতিয়াছে, সেও ঘন ঘন রোহিতাশ্বকে কোমল দংশন করিতে

শ্মশানঘাটে শৈব্যা ও রোহিতাশ্ব।

চাহিতেছে—কিন্তু পারিতেছে না। একবার হঠাৎ তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন, রোহিতাশ্ব একটু অন্যমনস্ক হইতেই সে তাহার একটী অঙ্গুলি কামড়াইয়া ধরিল। শৈব্যা তাড়াতাড়ি পক্ষি-শাবকটীকে সরাইয়া লইয়া কৃত্রিম কোপভরে কহিলেন, —"আঃ দুষ্ট পাখী, আমার বাছাকে কামড়াইলে—এত সাহস তোমার!" পাখী উত্তরে শৈব্যাকেও কামড়াইতে চাহিল।

হরিশ্চন্দ্র এ দৃশ্য দেখিয়া কতক্ষণ মুগ্ধভাবে অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তারপর ধীরে ধীরে যাইয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

শৈব্যা পতিকে দেখিয়া মৃদু-মধুর হাসিলেন,—হাসিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একটী বক্র কুটিল দৃষ্টি মহারাজের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া রোহিতাশ্বকে কহিলেন, "রোহিত, এসো তো বাছা, আমরা স্থানান্তরে যাই! মহারাজের সঙ্গে আমাদের আড়ি! তিনিও তোমায়, একটী হরিণ-শাবক দিবেন না, আমরাও তাঁকে

এই শুক-শাবকটী স্পর্শ ক'র্ত্তে দিব না। দেখি কি হয়!"

শৈব্যা রোহিতাশ্বকে হাতে ধরিয়া টানিলেন। রোহিত পিতার দিকে চাহিয়া নীরবে মধুর হাসিতে লাগিল। মাতার সঙ্গে যাইতে বড় বেশী ব্যগ্রতা প্রকাশ করিল না। হরিশ্চন্দ্র দ্রুত পুত্রকে কোলে করিয়া আবেগভরে তাহার মুখ চুম্বন করিলেন।

শৈব্যা হাসিয়া কহিলেন, "তুমি আমার বাছাকেও কাড়িয়া লইলে?"

হরিশ্চন্দ্র ম্লান হাসির সহিত উত্তর দিলেন—শৈব্যা, এই শেষ, আর আমি তোমাদের সম্মুখে আসিব না। আজ আমি—কত দিনের জন্য জানি না, তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি। আমায় বিদায় দাও।"

সর্ব্বনাশ! হরিশ্চন্দ্রের আজ এ কি মূর্ত্তি?—এ কি স্বর? হরিশ্চন্দ্র তো অন্য দিনের মত আজ সহজ, সরলকণ্ঠে কথা কহিতেছেন না! শ্রাবণের নিবিড়

মেঘের মত কি একটা প্রকাণ্ড অন্ধকার তাঁহার মুখ-মণ্ডলে আজ ঘনাইয়া আসিয়াছে !

শৈব্যা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। এক মুহূর্ত্তে তাঁহার ক্রীড়া কৌতুক ও মান-অভিমান কোথায় ভাসিয়া গেল। কোথা হইতে অকস্মাৎ মুখে এক অপূর্ব্ব করুণার জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল।

শৈব্যা—আজ কত দিনের পর কে জানে—মূর্ত্তিমতী দয়ার মত আসিয়া, এক করুণা-উচ্ছ্বসিত কাতর মূর্ত্তি লইয়া হঠাৎ হরিশ্চন্দ্রের হস্ত ধরিয়া দাঁড়াইলেন ! হরিশ্চন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন।

শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রের মুখের দিকে দীন দৃষ্টিতে চাহিয়া, ধীরে ধীরে কহিলেন—"কি হইয়াছে, বল ? তোমার আজ এ রুক্ষ মূর্ত্তি কেন ? কিছু ঘটিয়াছে কি ? আমায় বল, আমার শুনিতে বড় আগ্রহ জন্মিয়াছে—বলিবে না ?"

হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন, শৈব্যার এ নূতন মূর্ত্তি বড় সুন্দর ! শৈব্যা এত সুন্দরী ? কৈ তাঁহার এ রূপ তো
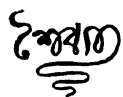
তিনি আর কখনও দেখেন নাই। জগদীশ্বর কি হরিশ্চন্দ্রকে সাম্রাজ্যের বিনিময়ে আজ এই মহাপুরস্কার দিলেন? হরিশ্চন্দ্র রোমাঞ্চিত হইলেন। এক মুহূর্ত্তে তিনি রাজসভার সকল কথা ভুলিয়া গেলেন।

হরিশ্চন্দ্রকে নীরব থাকিতে দেখিয়া শৈব্যা আবার কহিলেন,—"বল না, চুপ করিয়া রৈলে যে? কি হইয়াছে বল, আমার বড় আশঙ্কা হইয়াছে, শীঘ্র বল, আর বিলম্ব করিও না! আমি তোমারই, আর কাহারও নই—আমায় বল।"

শৈব্যার স্বরে আরও করুণা, আরও মধুরতা কে যেন ছড়াইয়া দিল। হরিশ্চন্দ্র ভাবিলেন, -এই কি সেই শৈব্যা?-- যে শৈব্যা কথায় কথায় অভিমান করিত, সে শৈব্যা এই? প্রকাশ্যে কহিলেন, "শৈব্যা, বিষম অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছে। আমি কর্ত্তব্যের অহঙ্কারে আজ সর্ব্বস্ব বিশ্বামিত্রকে দান করিয়া আসিয়াছি, তোমা-দের কি হইবে, সে কথা একবারও চিন্তা করি নাই।

কা'লই এ রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। এমন কি, এ রাজ্যে তোমাদিগেরও থাকিবার অধিকার নাই। তাই ভাবিতেছি, তোমাদিগকে তোমার পিত্রালয়ে রাখিয়া কল্য প্রত্যূষেই আমি অন্যত্র যাত্রা করিব।"

শৈব্যার মস্তকে অকস্মাৎ যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। শৈব্যা ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন,—"মহারাজ, আমাদিগকে আমার পিত্রালয়ে রাখিয়া যাইবে, আর তুমি স্বয়ং কোথায় যাইতেছ ? তুমি যেখানে যাইবে, তোমার চিরদাসী শৈব্যারও কি সেখানে যাইবার অধিকার নাই ? এ দাসীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে কি তোমার এত আপত্তি ?"

শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রের মুখের দিকে অধিকতর দীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। হরিশ্চন্দ্রের বোধ হইল যেন দৈন্য ও সহানুভূতি সশরীরে আসিয়া আজ তাঁহাকে এক সঙ্গে আলিঙ্গন করিয়াছে। হায়, শৈব্যার এ মূর্ত্তি এতদিন কোথায় ছিল ? এতদিন কেন শৈব্যা এ

মূর্ত্তি দেখান নাই, আজ বিদায়ের কালে শেষ মুহূর্ত্তে শৈব্যা এ রূপের জ্যোতিঃ খুলিয়া বসিলেন কেন ?

হরিশ্চন্দ্র প্রিয়তমার হস্তখানি নিজ হস্তে লইয়া সযত্নে তাহা বক্ষোপরি রাখিলেন। কহিলেন,—"শৈব্যা, তুমি এত সুন্দর! এতখানি সহানুভূতি তোমার? এত দিন কেন এ কথা তুমি আমায় জানিতে দাও নাই? আজ--"

শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রকে আর কহিতে দিলেন না। বাধা দিয়া আবেগভরে কহিলেন,—"মহারাজ, আমি মহাপাতক করিয়াছি। হায়, কে জানিত যে এইভাবে আজ আমাদের সুখ-স্বপ্ন এইখানেই ভগ্ন হইয়া যাইবে! কিন্তু মহারাজ, আমার প্রতি অবিচার করিও না। আমি তোমারই মঙ্গলের জন্য এ কার্য্য করিয়াছি। তুমি আমার নিকটে দিবস-রজনী পড়িয়া থাকিতে, প্রজাগণ তাহাতে বড় অসন্তুষ্ট হইত—তোমার কলঙ্ক রটাইত, সেই কলঙ্ক মুছিয়া ফেলিবার জন্যই আমি এই পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলাম। সকল কথা বলিলে, পাছে তুমি প্রজাগণের

উপবনে হরিশচন্দ্র, শৈব্যা ও রোহিতাশ্ব

উপর রুস্ট হও, রাজধর্ম্ম পালন করিতে কুণ্ঠিত হও, তাই আমি সে কথা এতদিন ভাঙ্গিয়া বলি নাই, ছলে অভিমানের অভিনয় করিয়া তোমায় দূরে দূরে রাখিয়াছি। প্রভু, আজ সে বাধা বিনষ্ট হইল—আজ আমায় সঙ্গে লইতে কুণ্ঠিত হইও না।"

হরিশ্চন্দ্র মুগ্ধ হইলেন; রোমাঞ্চিত কলেবরে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; ভাবিতে লাগিলেন—"আমি রাজ্যটি দান করিয়াই সর্ব্বস্ব দান করিয়াছি বলিয়া মনে করিতেছিলাম, আমার সর্ব্বস্ব তো এইখানে! এই রাজ্যদানই আজ আমায় সর্ব্বস্ব ফিরাইয়া দিতেছে! আজ আমি পৃথিবীর বিনিময়ে শৈব্যাকে পাইয়াছি। মহর্ষির কৃপায় আজ আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখী। দূর দেশে, পথে-পথে, দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময়ও যদি একবার শৈব্যার এই হৃদয়ভরা ভালবাসার কথা মনে পড়ে, আমার সুখের অবধি থাকিবে না—অনন্ত সুখ উপভোগ করিব। হায়, এই শৈব্যাকে আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম!"
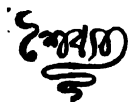
ভাবিতে ভাবিতে হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, "শৈব্যা, তুমিই ধন্যা, আমিই পাপিষ্ঠ। আমি তোমাকে ভুল বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু শৈব্যা, আমার সঙ্গে তুমি কোথায় যাইবে? তুমি রাজরাণী, রাজনন্দিনী, চিরকাল সুখের ক্রোড়ে বর্দ্ধিত!—আমার সঙ্গে পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়ান তো তোমার কাজ নয়! শোন শৈব্যা, আমি আজ সত্যই পথের ভিখারী হইয়াছি—সর্ব্বস্ব বিশ্বামিত্রকে দিয়াছি, এক কপর্দ্দকও নিজস্ব বলিতে সম্বল রাখি নাই; এমন কি, বরং কিছু ঋণ করিয়াছি—আমি মহর্ষিকে দানের দক্ষিণা সহস্র মুদ্রা দিতে পণে আবদ্ধ, অথচ সে অর্থ এখনও দিয়া উঠিতে পারি নাই। এক পক্ষ মধ্যে সে অর্থ যেমন করিয়া হউক দিতে হইবে, নতুবা ব্রহ্ম-শাপে সূর্য্যবংশের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে। সে অর্থের জন্য আমার পথে-পথে উন্মত্তের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ান চাই—তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাইবে?"

শৈব্যা ব্যথিত হইলেন। মুক্তাফলের ন্যায় দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার দুই চক্ষের কোণে ঝলমল করিয়া জ্বলিতে লাগিল। শৈব্যা কহিলেন, "মহারাজ, তুমি আজ এ কি কথা কহিলে? তুমি পরম পণ্ডিত, শাস্ত্রবিদ্; তুমিই বল যে, রমণীগণ স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ—তাঁহার সুখ-দুঃখের সমান অংশভাগিনী; যদি তাই হয়, তবে তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য করিতে বিরতা হইবে কেন? তুমি কেন আমায় আমার কার্য্য সম্পাদনে বাধা দিবে? না মহারাজ; আমি তোমাকে ফেলিয়া রাজ-প্রাসাদে সুখভোগ করিতে থাকিতে পারিব না। আর তুমিও এটা ভুল বুঝিতেছ, তোমার সঙ্গে থাকিয়া পথে-পথে কাননে-কাননে, অনশনে অনিদ্রায় ভ্রমণে আমার যে সুখ, তোমাকে ছাড়িয়া রাজ-প্রাসাদের চরম বিলাসোপভোগেও তাহা নাই। মহারাজ, আমার পূর্ব্ব ব্যবহার দেখিয়া আমায় অবিশ্বাস করিও না—আমায় তোমার সঙ্গে লও।"

শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রের পদযুগল ধারণ করিলেন।

হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে পূর্ণাবেগে উঠাইয়া কণ্ঠে আশ্রয় দিলেন। শৈব্যা প্রিয়তমের কণ্ঠ-লগ্ন হইয়া আজ অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিলেন। রোহিতাশ্ব এই সকল দেখিয়া "মা মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মাতা পুত্রকে সান্ত্বনা দিতে ফিরিলেন। হায়! অবোধ শিশুর সরল প্রাণেও আজ কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়াছে! শৈব্যা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন,—'মহারাজ! চল, আর এ প্রমোদ-কাননে নয়—গৃহে গমন করি। তথায় সকল কথা বিচার করিয়া যথা-যুক্তি করা যাইবে এখন। তুমি আমাকে কিছুতেই অন্যত্র পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে না—ইহা ধ্রুব জানিও। স্বামীর বিপদে যে স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র থাকে, তাহার ন্যায় পাপিষ্ঠা আর কোথায়? আমি আজই সমস্ত রাজ্যৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া তোমার অনুসরণ কারবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিব—তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী আমি—অর্দ্ধাঙ্গিনীর মতই সুখে-দুঃখে সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রহিব।"

এই বলিয়া শৈব্যা পতিকে লইয়া ধীরে ধীরে অন্তঃপুরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। হরিশ্চন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন—"অন্ধকারের মধ্যেও আজ এ কি জ্যোতিঃ, এ কি আলোক-রশ্মি ফুটিয়া উঠিল! এত বিপদের মধ্যেও আজ এ কি সুখ!"

(৭)

এ দিকে এই কাণ্ড, ওদিকে রাজ্যে মহাবিভ্রাট পড়িয়া গেল। রাজা রাজ্য ছাড়িয়া বারাণসী প্রস্থান করিতেছেন—শুনিয়া প্রজাদের বুক ফাটিয়া যাইতে চাহিল। কেহ কেহ বিশ্বামিত্রকে গালি দিল, কেহ কেহ বিধাতাকে ডাকিল, কেহ কেহ বা রাজা-রাণীকে বুঝাইয়া-শুঝাইয়া এ দারুণ সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না।

পরদিন অতি প্রত্যূষে অযোধ্যার নরনাথ রাজমহিষী শৈব্যার হাতে ধরিয়া সত্য সত্যই অযোধ্যার

রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন! শৈব্যা রোহিতাশ্বকে ক্রোড়ে লইয়া আসিলেন। যে রোহিতাশ্ব বহুমূল্য বেশ-ভূষায় সর্ব্বদা সজ্জিত থাকিত, যে শৈব্যা সর্ব্বদা অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব মহার্ঘ অলঙ্কারে বিভূষিতা থাকিতেন, তাঁহাদের অঙ্গে সে দিন একখানি সামান্য বসন ব্যতীত অন্য আভরণ নাই! শৈব্যার অঙ্গে অলঙ্কারের মধ্যে সে দিন সধবার চিহ্ন শঙ্খ-সিন্দূর মাত্র শোভা পাইতেছে, আর কিছুই দেখা যাইতেছে না। হরিশ্চন্দ্র নগ্নপদ, তদ্রূপ একবস্ত্র—নিরস্ত্র!

তিন জনে রাস্তায় পড়িয়া ধীর গম্ভীর ভাবে যাইতে লাগিলেন। প্রজাগণ চারিদিক্ হইতে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা জয়ধ্বনিও করিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কেহই তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারিল না। রাজা-রাণী পুত্র সমভিব্যাহারে ক্রমে নগরীর প্রান্তভাগে পদার্পণ করিলেন।

নগরী পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ প্রজাদিগকে বলিলেন,—"আর কেন? তোমরা এখন গৃহে যাও, আর
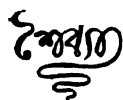
আমি তোমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি না। তাহা হইলে মহর্ষি ক্রুদ্ধ হইবেন।”

সাশ্রুনয়নে বিহ্বলচিত্তে প্রজারা অগত্যা রাজাদেশ পালন করিল।

হরিশ্চন্দ্র শেষ একবার স্তব্ধ নয়নে পশ্চাতে রাজধানীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন! হায়, চিরকালের জন্য আজ তিনি এই বংশপরম্পরানুক্রমে অধিকৃত রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন—আর কি কখনও এ প্রিয় ছবি তাঁহার নয়নসমক্ষে ফুটিয়া উঠিবে?

হরিশ্চন্দ্র চিন্তা করিবারও অবসর পাইলেন না। উষার স্বর্ণধারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঋষির নৃশংস ক্রোধচ্ছটার মত তাঁহাকে দগ্ধ করিতে আসিতেছিল, হরিশ্চন্দ্র দ্রুত রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া প্রান্তরে যাইয়া পড়িলেন। অবিলম্বেই তাঁহাদের তিনটী ক্ষুদ্র ছায়া দূরে চক্রবালের অন্তরালে তিনটী ক্ষীণ নক্ষত্রের মত ডুবিয়া গেল!

যার কাজ তারে সাজে।

যার কাজ তারে সাজে।

(১)
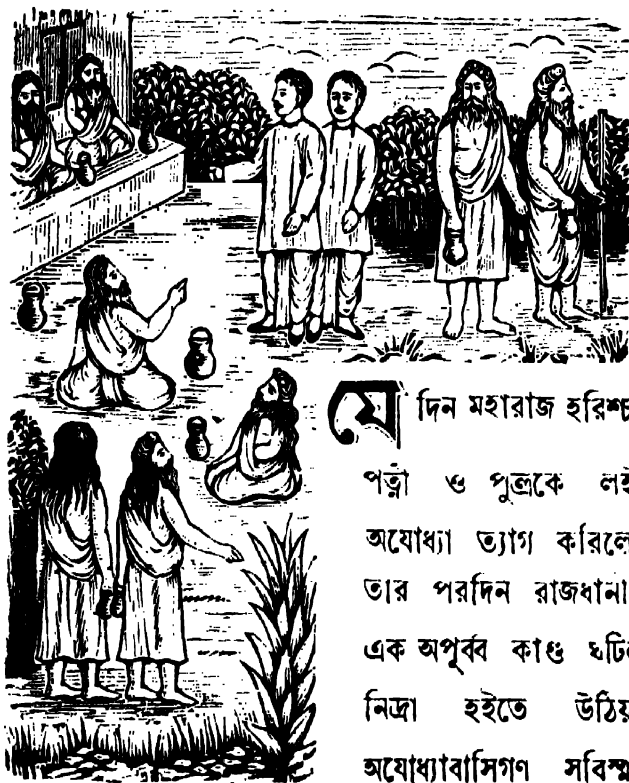
যে দিন মহারাজ হরিশ্চন্দ্র পত্নী ও পুত্রকে লইয়া অযোধ্যা ত্যাগ করিলেন, তার পরদিন রাজধানীতে এক অপূর্ব্ব কাণ্ড ঘটিল। নিদ্রা হইতে উঠিয়াই অযোধ্যাবাসিগণ সবিস্ময়ে
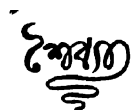
দেখিল, তাহাদের নগরটা সুদীর্ঘ-জটাজুট-মণ্ডিত, গৈরিক-বসনধারী অগণিত ব্রহ্মচারীতে ভরিয়া গিয়াছে!

ব্রহ্মচারীরা কখন নগরে প্রবেশ করিয়াছেন, কেহ তাহা জানে না। তাঁহারা রাস্তায়, ঘাটে, বৃক্ষতলে এবং নাগরিকদিগের ঘরের দাওয়ায়, যে যেখানে পারিয়াছেন দিব্য কম্বল বিস্তৃত করিয়া উপবেশন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বা ধ্যান করিতেছেন, কেহ কেহ বা কমণ্ডলু মাজিতেছেন, কেহ কেহ বা বৃক্ষকাণ্ড সংগ্রহ করিয়া হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার ব্যবস্থা দেখিতেছেন।

নাগরিকগণ উঠিয়া দ্বার উন্মোচন করিতেই তাঁহারা চারিদিক হইতে "জয় গুরুদেব" বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তারপর যে যার কমণ্ডলু, মৃগচর্ম্ম ও কম্বল লইয়া তাহাদের গৃহে ঢুকিতে লাগিলেন!

নাগরিকগণ এই অপূর্ব্ব কাণ্ড দেখিয়া মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—"হ্যাঁ হ্যাঁ, কর কি? কর কি?"

কিন্তু কে তাহাদিগের কথা শোনে? তাঁহারা "গুরুদেবের আজ্ঞা" এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া গৃহের মধ্যে বেশ জমকাইয়া বসিলেন, তারপর সিদ্ধির পুটলী খুলিয়া মহাসমারোহে সিদ্ধি ঘুটিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন!

নগরবাসিগণ দেখিয়া শুনিয়া অবাক্—তাহারা এ উহার পানে চাহিতে লাগিল!

একজন আসিয়া একটু সাহস করিয়া ব্রহ্মচারী-দের প্রণাম করিয়া বলিল,—"প্রভু, আপনারা কে? কেনইবা এত অধিক অনুগ্রহ করিয়া আমাদের গৃহে আসিয়া একবারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া বসিয়াছেন? আমরা স্ত্রী পুত্র লইয়া এখন কোথায় যাইব?"

ব্রহ্মচারিগণ কহিলেন,—"তোমরা গ্রামে যাও। যতদিন হরিশ্চন্দ্র ছিলেন, ততদিন তোমরা রাজকর্ম্ম করিয়াছ, নগরেও বাস করিতে পাইয়াছ, এখন এ রাজ্যের ভার আমাদের উপর, প্রভু বিশ্বামিত্র এখন এ
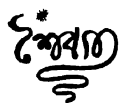
রাজ্যের ভার আমাদের উপরই দিয়াছেন—এখন আমরাই এ নগরীর একমাত্র অধিকারী।”

তখন নগরবাসিগণ একটু একটু করিয়া ব্যাপার খানা বুঝিল। তাহারা অগত্যা তল্পিতল্পা গুছাইতে লাগিল। তাহারা যে বড় দুঃখিত হইল, তাহা নহে। যে রাজ্যে হরিশ্চন্দ্র নাই, সে রাজ্যে থাকিয়াই বা সুখ কি? তবে বনবাসী তপস্বী মহাপ্রভুদের কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া তাহাদের বড় হাসি পাইতে লাগিল!

ব্রহ্মচারীদের নগরে থাকিবার অভ্যাস নাই, বহু-দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অসুবিধার আর সীমা রহিল না। তাঁহারা না জানেন অট্টালিকায় থাকিতে, না জানেন সোণার থালে খাইতে, না পারেন তক্তপোষে শুইতে!

তাঁহারা তক্তপোষের উপরে পূজার্চ্চনার স্থান করিলেন; উহাদের নীচে কম্বল বিছাইয়া শুইলেন; তল্পিতল্পাগুলি সুন্দর সুন্দর আসনগুলির উপরে রাখিলেন; চামরগুলি নিয়া ঘর ঝাড় দিলেন!

তারপর নগরের নানা অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া

তাঁহারা যে কত অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলিতে লাগিলেন, তাহার সংখ্যা কে করে !

ব্যাপার দেখিয়া প্রজারা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। ইঁহারা এই রাজ্য শাসন করিবেন ? সর্ব্বনাশ ! না জানি অযোধ্যার অদৃষ্টে কি দুর্দ্দশাই লিখিত রহিয়াছে ! তাহারা নগরী পরিত্যাগ করিয়া দূরে, বহুদূরে, যতদূরে সম্ভব, অন্যত্র চলিয়া গেল।

(২)

ম হর্ষির চেলাদিগের এই সংবাদ; এখন স্বয়ং বিশ্বামিত্র ঋষির বর্ণনা করিতেছি, শোন।

হরিশ্চন্দ্র রাজ্য হইতে চলিয়া গেলে ঋষিবর পরদিনই রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজসভায় তখনও রাজকার্য্য চলিতেছে, মন্ত্রিবর প্রজার দিকে চাহিয়া তখনও রাজাশূন্য রাজ্যে রাজকার্য্য চালাইতেছেন। ঋষিবরকে দেখিয়া তিনি সপারিষদ আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন।

ঋষিবর আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন,—"তোমরা আজই রাজকার্য্যের সমস্ত ভার আমার চেলাদিগকে বুঝাইয়া দাও, আমি রাজ্যের নূতন বন্দোবস্ত করিব।"

মন্ত্রিবর সবিনয়ে কহিলেন, "প্রভু, এ রাজ্য এখন আপনারই—আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক রাজ্যভার গ্রহণ করিলেই হয়, আমরাও আপনার জন্যই অপেক্ষা করিতেছি।"

ঋষিবর "তথাস্তু" বলিয়া সেই দিনই তাহাদিগের নিকট হইতে রাজ্যভার বুঝিয়া লইলেন। মন্ত্রীও পারিষদবর্গকে লইয়া সেই দিনই অপরাপর প্রজাদের ন্যায় অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র এককালে ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন,—এ কথা বলিয়াছি। সেই গর্ব্বেই ঋষিবর আজ এই গুরুভার গ্রহণ করিলেন,—কিন্তু দু'দিন না যাইতে যাইতে বুঝিলেন, সেই পুরাতন বিদ্যা লইয়া রাজ্য করা এখন আর চলে না!

রাজ্যভার গ্রহণ করাতে ঋষিবরের যজ্ঞাদি মাঙ্গলিক কার্য্যানুষ্ঠানে বিস্তর বিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল।

ঋষিবর মাঙ্গলিক কার্য্য করিবেন কি?—রাজ্যের শুভাশুভ পরিদর্শন করিতেই তাঁহার সমস্ত সময় অতিবাহিত হয়, সমস্ত শক্তি ব্যয় হইয়া যায়! কিন্তু

তথাপি সে কার্য্যটুকু যে খুব সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারেন, তাহা নহে।

ঋষিবর শাসন করেন তো সংরক্ষণ করিতে পারেন না; সংরক্ষণ করেন তো শাসন করিতে ভুলিয়া যান; আয়ের হিসাব রাখেন তো ব্যয়ের হিসাবে গোল বাঁধে, ব্যয়ের হিসাব রাখেন তো আয়ের হিসাবে ভুল হয়,—ঋষিবর মহাবিভ্রাটে পড়িলেন!

এ দিকে এই সব গোলযোগে রাজকার্য্য আরও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। রাজ্যে আর হরিশ্চন্দ্র নাই—প্রজারা নির্ভয়ে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে লাগিল। প্রতিদিন শত-সহস্র লোক বিচারপ্রার্থী হইয়া নানাদিক্ হইতে মহর্ষির সমীপে উপস্থিত হইতে লাগিল! মহর্ষি সে সকলের অতি অদ্ভুত মীমাংসা করিতে লাগিলেন। সুবিচার হইতেছে না দেখিয়া প্রজারা ক্রমে আরও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল।

তখন মহর্ষির যাগ, যজ্ঞ ও তপস্যাদি কার্য্যানুষ্ঠান একবারেই বন্ধ হইয়া গেল!

এই কি সেই ?

এই কি সেই ?

(১)
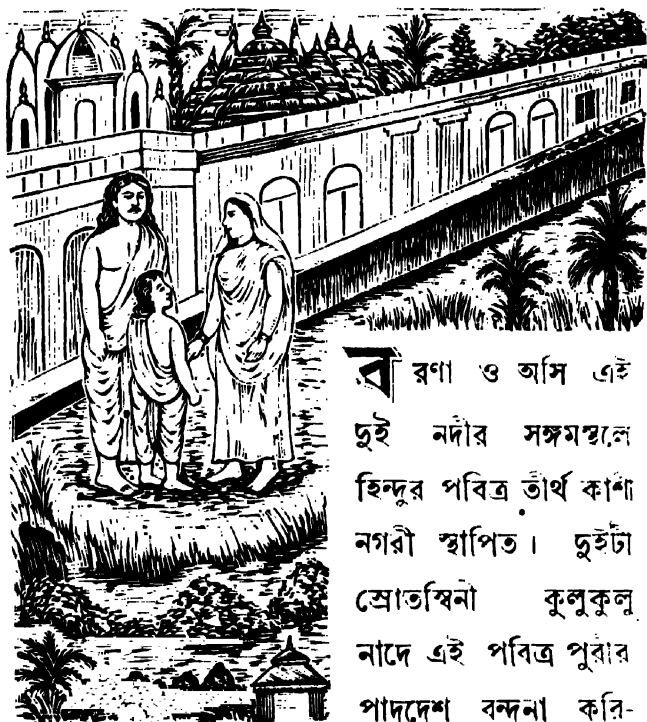
বরণা ও অসি এই দুই নদীর সঙ্গমস্থলে হিন্দুর পবিত্র তীর্থ কাশী নগরী স্থাপিত। দুইটী স্রোতস্বিনী কুলুকুলু নাদে এই পবিত্র পুরীর পাদদেশ বন্দনা করিতেছে, যেন পার্ব্বতী ও গঙ্গা একসঙ্গে মহেশ্বরকে আলিঙ্গন করিতেছেন ;

বরণার স্বচ্ছ, পবিত্র বারিরাশির উপরে অসংখ্য প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানরাজি ; ঘাটের উপরে মন্দির, মঠ ও বৃক্ষাদির মনোরম শোভা ; সলিলতলে তাহাদের কাল কাল প্রতিবিম্ব অঙ্কিত ; দূরে নদীর এক প্রান্ত এক অনুর্ব্বর বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। সেই প্রান্তরে নদীর তীরে একটী বৃহৎ বটবৃক্ষতলে আর এক শ্রেণী পুরাতন জীর্ণ সোপান। সেই সোপানাবলির উপর রাত্রিশেষে দুইটী শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক আসিয়া বসিল।

তখনও প্রভাতী সঙ্গীত ইতস্ততঃ ধ্বনিত হয় নাই, তখনও নিশার অন্ধকার চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছে—একটু একটু করিয়া পলায়ন করিবার সুযোগ খুঁজিতেছে, তখনও পূর্ব্বাকাশে দিনমণির রক্তিম দূত একটু একটু করিয়া উঁকি ঝুঁকি দেয় নাই, তখনও কাশীর রাজপথগুলি নিস্তব্ধ নিঝুম—দেবালয়ে দেবালয়ে তখনও সুগন্ধি প্রদীপ শান্তস্নিগ্ধ জ্যোতিতে মিটিমিটি জ্বলিতেছে ; নীলাকাশের বক্ষে বারাণসীর শত

সহস্র মন্দিরচূড়া চিত্রার্পিতবৎ ন্যস্ত হইতে তখনও একটু বিলম্ব আছে। মূর্ত্তিত্রয় সেই খানে বসিয়া বরণার শীকর-সিক্ত প্রান্তরের মুক্ত সমীরে শ্রান্তি দূর করিতে লাগিল।

পথিকদিগের মধ্যে একটী পুরুষ অন্যটী রমণী। পুরুষ সঙ্গিনী রমণীটার হস্ত ধারণ করিয়া বসিয়াছেন, রমণীটীর ক্রোড়ে একটী নিদ্রিত বালক।

কতক্ষণ বসিয়া বসিয়া পুরুষটী রমণীকে কহিলেন,—"শৈব্যা, বড় পিপাসা হইয়াছে, তুমি এইখানে বইস, আমি নীচে জলপান করিয়া আসি, এ দারুণ তৃষ্ণা আর কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছি না।"

রমণী কাতর দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিলেন। তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে চাহিল। একদিন যাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য শত সহস্র পরিচারিকা নিযুক্ত থাকিত, তিনি আজ এত অধিক পরিশ্রমের পরেও স্বয়ং নদীতে নামিয়া জলপান করিতে প্রস্তুত!

শৈব্যা স্বামীকে বাধা দিলেন।

শৈব্যা ধীরে ধীরে পুত্রকে একখণ্ড পাষাণের উপর

শায়িত করিয়া কহিলেন, "প্রভু, তুমি একান্ত শ্রান্ত হইয়াছ, উঠিও না। তোমার সহস্র দাসী গিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও একজন আছে, সে থাকিতে তুমি নিজে জল সংগ্রহ করিতে যাইতে পারিবে না। তুমি অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্র জল আনিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া শৈব্যা নিজেই সোপান বাহিয়া নামিতে লাগিলেন। হরিশ্চন্দ্র বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিলেন!

এই শৈব্যা দাসী! হরিশ্চন্দ্রের সহস্র কিঙ্কর, কিঙ্করী ছিল সত্য; কিন্তু শৈব্যারও তো তাহা ছিল। বরং শৈব্যার মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য হরিশ্চন্দ্রকেও বিব্রত হইতে হইত! সেই শৈব্যার একি আত্মত্যাগ, একি দৈন্য, একি পরার্থপরতা! হরিশ্চন্দ্র ভাবিয়া পাইলেন না, শৈব্যার এত শক্তি আজ কোথা হইতে আসিল, রমণীর দুর্ব্বল শরীরে এ বল আজ কিরূপে সঞ্চারিত হইল? স্বভাবতঃ পুরুষ রমণী অপেক্ষা শক্তি-শালী; তাহারা মৃগয়া করে, যুদ্ধ-বিগ্রহ করে, তাহাদের শ্রান্তি সহজে জন্মে না। রমণী সদাই গৃহাবদ্ধা,

ঝরণার ধারে বোবা পথিক তৃষ্ণা দূর করিতেছে

কোমলাঙ্গী, সহজে দুর্ব্বলা—তাহাদের সে শ্রমসহন-ক্ষমতা বড় দেখা যায় না। কিন্তু তবু শৈব্যা আজ হরিশ্চন্দ্রকে কিরূপে পরাস্ত করিল? হরিশ্চন্দ্র ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় ও পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু শৈব্যার মুখে কাতরতা নাই! সেই শৈব্যা—যে শৈব্যা সহস্র কিঙ্করীর সেবাতেও নানা মান অভিমান করিতে ভুলিতেন না—সেই শৈব্যার মুখে কাতরতা নাই।

শৈব্যা ধীরে ধীরে পাষাণখণ্ডগুলিকে ধরিয়া ধরিয়া নীচে নামিলেন, নামিয়া অঞ্জলি পূরিয়া জল তুলিতে লাগিলেন। উঠিবার সময় হাতে জল থাকে, সিঁড়িগুলি ধরিতে পারেন না—এক একবার ক্লান্তিতে পড়িয়া যাইতে চান, কিন্তু হরিশ্চন্দ্রকে তাহা কিছুতেই বুঝিতে দেন না, প্রাণপণ চেষ্টায় জল লইয়া উঠেন, উঠিয়া প্রিয়পতিকে তৃপ্ত করেন। হরিশ্চন্দ্রের শুষ্ক মুখে যেই একটু স্নিগ্ধভাব ফুটিয়া উঠে, অমনি শৈব্যা সব বিস্মৃত হন, জল লইয়া উঠিবার সময় যে কষ্টটুকু হইয়াছে, তখনই একেবারে ভুলিয়া যান। শৈব্যা নূতন বলে,

নূতন উৎসাহে আবার জল আনিতে যান। এই ভাবে শৈব্যা অনেক পরিশ্রমে স্বামীর তৃপ্তি বিধান করিলেন। হরিশ্চন্দ্র বারংবার নিবারণ করিয়াও তাঁহাকে বিরত রাখিতে পারিলেন না।

শৈব্যা এইরূপে স্বামীর তৃষ্ণা সুচারুরূপে দূর করিয়া পরিশেষে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন, ধীরে ধীরে তার পর তাঁহার হাতটী নিজ হস্তে উঠাইয়া লইলেন। হরিশ্চন্দ্র অঞ্জলি অঞ্জলি জলপান করিয়াও এতক্ষণ যে তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই, শৈব্যার এই হস্তস্পর্শে ততোধিক তৃপ্তি অনুভব করিলেন। তাঁহার সকল পরিতাপ যেন এই হস্তস্পর্শে দূর হইয়া গেল। প্রান্তরের শীতল বাতাসও একটু একটু করিয়া তাঁহার ললাটের ঘর্ম্মবিন্দু মুছিয়া দিল।

এমন সময় হঠাৎ চারিদিকে একটা তুমুল আনন্দ-ধ্বনি উঠিল। অকস্মাৎ শত শত নহবৎ, শত শত কাঁসর, শত শত ঘণ্টাধ্বনি দেবালয়ে দেবালয়ে প্রভাতী সঙ্গীত ধ্বনিত করিল। হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা চমকিত

হইয়া উঠিলেন। চাহিয়া দেখিলেন,—রজনী প্রভাত হইয়াছে—পূর্ব্বাকাশে রক্তিমচ্ছটা শত ধারায় বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সে ছটা বরণার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে রজত-চূর্ণ ছড়াইয়া দিতেছে।

হরিশ্চন্দ্র তখন উঠিয়া "জয় বিশ্বনাথজী কি জয়" বলিয়া সেই পবিত্র পুরীর দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক একবার ভক্তিভরে যুক্ত করে প্রণাম করিলেন। শৈব্যাও পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া উঠিয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাই করিলেন। তারপরে উভয়ে ধীরে ধীরে নগরীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

কাশীর রাজপথে তখন একটি একটি করিয়া লোক-সঞ্চার হইয়াছে। একজন দু'জন করিয়া বহুলোক ক্রমে "জয় বিশ্বনাথজী কি জয়" রবে ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছে। চারি দিকে মন্ত্রধ্বনি, বাদ্যধ্বনি ও গীতধ্বনি শোনা যাইতেছে। হরিশ্চন্দ্র সেই সব আনন্দোৎসবের ভিতর দিয়া পত্নীর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইলেন।

দানবেশধারী রাজা রাণীকে সেদিন কাশীবাসী কেহই
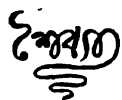
চিনিতে পারিলেন না। রাজা-রাণীর আজ আর সে বেশ ভূষা নাই—কি করিয়াই বা চিনিবে? রাজবেশ-ভূষার পরিবর্ত্তে সেদিন তাঁহাদের অঙ্গে অতি দরিদ্রের বেশ স্থান পাইয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের চরণে পাতুকা নাই, শৈব্যার অঙ্গে শঙ্খ-সিন্দূর ভিন্ন অন্য আভরণ নাই, রোহিতাশ্ব একবস্ত্র।

প্রস্তর-মণ্ডিত রাস্তায় চলিতে চলিতে তাঁহাদের বারংবার পদস্খলন হইতে লাগিল। সময়ে সময়ে ইষ্টক-খণ্ড পদে ঘর্ষিত হইয়া বিষম আঘাত লাগিল, কিন্তু তবু কাহারও মুখে বাক্যটী ফুটিল না। হরিশ্চন্দ্র এ সব কায়িক কষ্টের প্রতি ভ্রূক্ষেপশূন্য, শৈব্যা ভর্ত্তার চরণের দিকে চাহিয়া—তন্ময়! হরিশ্চন্দ্রের চরণে—এক এক বার এক একটা প্রস্তর ঘর্ষিত হইতেছিল, আর শৈব্যার হৃদয়ের এক একখানি হাড় নড়িয়া নড়িয়া উঠিতে-ছিল—নিজের যে চরণ ফাটিয়া রক্তস্রোত বহিতেছিল, সে দিকে বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য নাই।

রোহিতাশ্ব এতক্ষণ নিদ্রিত ছিল, এইবার জাগরিত

হইল। হায়, অবোধ শিশু কিছুই জানে না, উদরের জ্বালা ভিন্ন তখনও সে অন্য জ্বালার সন্ধান পায় নাই। পাইলে বোধ হয় এতক্ষণ এত নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারিত না।

নিদ্রাভঙ্গে সে আপনার চারিদিকে এক অপূর্ব্ব নূতন দৃশ্য দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল। মৃদু হাসিয়া পিতা মাতাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে গেল, কিন্তু পিতা মাতার বেশ ভূষা ও অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া আর তাহা করিল না। কে যেন তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "রোহিতাশ্ব! অবোধ শিশু! কি করিতেছ? দেখিতেছ না তোমার পিতা মাতার কি অবস্থা হইয়াছে—এ সময় কি তোমার কথা সাজে!" শিশু নীরব রহিল।

পিতা মাতা শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিলেন, তাহার ক্ষুধা বোধ হইয়াছে; তখন তাঁহারা একটা দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার জন্য কিঞ্চিৎ দেবতার প্রসাদ চাহিয়া লইলেন, সেই প্রসাদে রোহিতাশ্বের ক্ষুধা কতকটা দমিত হইল। তারপর রাজদম্পতী আবার চলিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে তাঁহারা কাশীর সকল দেবালয়েই সেদিন এইরূপ ভাবে দেবতা দর্শন করিয়া বেড়াইলেন, তারপর সন্ধ্যা-সমাগমে আশ্রয়-স্থানের অনুসন্ধানে কোনও ধর্ম্মশালায় আসিয়া উপনীত হইলেন।

তীর্থশ্রেষ্ঠ বারাণসীতে ধনী, দরিদ্র, নিঃসহায়—কাহারও থাকিবার বা উদরপূর্ত্তি করিবার কোনরূপ অসুবিধা নাই। নানারূপ ছত্র, ধর্ম্মশালা ও দাতব্য ভাণ্ডার তথায় গরীব দুঃখীর জন্য সর্ব্বদা মুক্ত আছে। একটা ক্ষুদ্র সামান্য কুটীরে রাজা-রাণীর থাকিবার বন্দোবস্ত হইল। নানারূপ সুরম্য হর্ম্ম্য পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াও রাজদম্পতী আজ এই সামান্য কুটীরে আশ্রয় লইলেন! অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের মর্ম্মরময় মেজেতে পালঙ্কের উপরে যাঁহাদের ঘুম হইত না, তাঁহাদের শয্যা আজ এই কুটীরে মৃত্তিকাময় মেজেতে রচিত হইল!

শীতে সুখে দুঃখে তাঁহাদের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। সুখ? হাঁ, সেই মৃত্তিকাময় ক্ষুদ্র কুটীরেও রাজদম্পতী এক সুখের সন্ধান পাইলেন। সে সুখ তাহারা অনেক দিন উপভোগ করেন নাই। তাঁহাদের সকল দুঃখ বুঝি সেই সুখে চাপা পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। সুধু বিশ্বামিত্রের ঋণের কথাই উহাতে বাদ সাধিল। এই কুটীরে হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার অকৃত্রিম ভালবাসা, সহানুভূতি ও পাতিব্রত্যের পরিচয় পাইলেন।

হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন, শৈব্যা আর সে শৈব্যা নাই। সে শৈব্যা কি করিয়া এমন হইলেন? তেমন অভিমানিনী ললনা কি করিয়া এত সরলা, এত পরদুঃখকাতরা
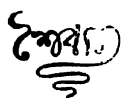
হইলেন ? তেমন বিলাসানুরাগিণী চঞ্চলা কামিনী কি করিয়া আজ এত আত্মবিসর্জ্জন শিখিয়াছেন ?

হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার কষ্টসহিষ্ণুতা দেখিয়া অবাক্ হইলেন। হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন, অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে লক্ষ কিঙ্করীরা প্রতিদিন যত না পরিশ্রম করিয়াছে, শৈব্যা আজ-কাল দৈনিক ততোধিক পরিশ্রম করিতেছেন। শৈব্যা শয্যা হইতে উঠিয়া প্রত্যহ ঘর-দরজা পরিষ্কার করেন, স্বামীর পূজোপকরণ প্রস্তুত রাখেন, স্বামীকে ও রোহিতাশ্বকে স্বহস্তে স্নান করাইয়া দেন, দেবালয় হইতে সকলের জন্য দেবতার প্রসাদ নিজে লইয়া আইসেন, তারপর অবসরকালে স্বামীর পদসেবা করেন। দেখিয়া শুনিয়া হরিশ্চন্দ্রের চক্ষে জল আসিতে চাহিল। হায়! মহর্ষির ঋণের জন্য যদি ভাবনা না থাকিত, তবে, এই ক্ষুদ্র কুটীরে এইরূপ দীনভাবে থাকিয়াই তিনি আজ কত না সুখী হইতে পারিতেন! কিন্তু এত সুখের মধ্যেও তাঁহার অদৃষ্টে আজ প্রকৃত শান্তি নাই। তাঁহার সকল সুখ-

শান্তির উপর, ঋণচিন্তা একখানি শাণিত অসির মত ঝুলিতেছে। কোন্ মুহূর্ত্তে যে পতিত হইয়া সব বিনষ্ট করিয়া দিবে, হরিশ্চন্দ্র তাহা জানেন না!

হরিশ্চন্দ্র ঋণচিন্তায় ক্রমে ক্রমে বড় অস্থির হইয়া উঠিলেন। শৈব্যা পূর্ব্বোক্তরূপ গৃহের সমস্ত কার্য্য করেন, ওদিকে হরিশ্চন্দ্র প্রত্যহ বাহিরে বাহিরে ঋণ পরিশোধের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ান। কি করিয়া যে এই ঋণ পরিশোধ করিবেন, হরিশ্চন্দ্র তাহা ভাবিয়া পান না।

ক্ষত্রিয়ের ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ, হরিশ্চন্দ্র ভাবেন,—কার্য্য করিয়া এ অর্থ সংগ্রহ করিব? কিন্তু কোথায় কার্য্য করিবেন, কে তাঁহাকে এত অর্থ দিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিবে? কাশী তীর্থস্থান, এখানে কেউ ক্ষত্রিয়ের কার্য্য চায় না, যোদ্ধৃবৃত্তিতে এখানে অর্থোপার্জ্জন অসম্ভব—হরিশ্চন্দ্র অনেক চেষ্টা করিয়াও কার্য্য পাইলেন না। চিন্তায় তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল।

প্রতিদিন ব্যর্থ প্রয়াসের পর সায়াহ্নে যখন ভর্ত্তা গৃহে ফিরিয়া আসেন, শৈব্যা জিজ্ঞাসা করেন,—"কি করিয়া আসিলে?" তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া হরিশ্চন্দ্রের মুখ কালিমাময় হইয়া উঠে, কি করিয়া তিনি সে মর্ম্মান্তিক কথা শৈব্যাকে জ্ঞাপন করিবেন? কিন্তু সেই কালিমাময় মুখ দেখিয়াই শৈব্যা সব বুঝিতে পারেন, আর প্রশ্ন করেন না। তখন তিনি যত্নে, নানা স্নেহ-সম্ভাষণে স্বামীর সে কষ্ট ভুলাইতে চেষ্টা করেন। পত্নীর সে মধুর সম্ভাষণে হরিশ্চন্দ্র অনেক কষ্ট ভুলিয়া যান,—রাত্রিটা কতক শান্তিতে কাটে, কিন্তু প্রভাত হইলে আবার সমগ্র চিন্তা নূতন হইয়া ফিরিয়া আসে। হরিশ্চন্দ্র আবার আকুল হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করেন। দুঃখিনী শৈব্যা তখন গৃহে বসিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া কেবল কাঁদেন, আর স্বামীর জন্য যুক্ত করে দেবতাদের চরণোদ্দেশে শত সহস্র প্রার্থনা করেন। শৈব্যার হৃদয়খানি তখন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একেবারেই চূরমার হইয়া যায়!

(৩)

কিন্তু এত ক্রন্দন সত্ত্বেও, শৈব্যার এত কাতর প্রার্থনা সত্ত্বেও দেবতারা যে তাঁহাকে একটু কৃপা করিলেন, এমন বোধ হইল না। শৈব্যা অনেক কাঁদিলেন বটে, দেবতাদিগের চরণে চরণে অনেক মস্তক পিষলেন বটে, কিন্তু দেবতারা যেমন অচল ছিলেন, তেমনি অচল রহিলেন—হরিশ্চন্দ্রের ঋণ পরিশোধের কোনই উপায় লক্ষিত হইল না।

প্রথম প্রথম হরিশ্চন্দ্র তত চিন্তাক্লিষ্ট হন নাই, শৈব্যার চেষ্টায় অনেক সময় ভবিষ্যৎ বিপদের কথা একবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ক্রমে তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য সে নিরুদ্বিগ্ন ভাবটাকে ছাপাইয়া উঠিল। ক্রমে হরিশ্চন্দ্র উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন। সূর্যবংশের নিপাত-দৃশ্য তিনি যেন চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্ট অঙ্কিত দেখিতে পাইলেন। শৈব্যা আর শত যত্ন-চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে
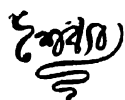
সে বিভীষিকা হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে পারিলেন না। তখন শৈব্যারও চারিদিক্ অন্ধকারময় হইয়া উঠিল।

শৈব্যা দেখিলেন, আর হরিশ্চন্দ্র ভাল করিয়া আহার করেন না, আর তেমন করিয়া আবেগ-পূর্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রী-পুত্রের দিকে ফিরিয়া চাহেন না, হরিশ্চন্দ্রের মুখে আর হাসি ও প্রফুল্লতা নাই—শৈব্যার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। এতখানি ভাগ্যবিপর্যয়ে যে শৈব্যা কাতরা হন নাই, রাজপ্রাসাদের সুখসম্ভোগের বিনিময়ে ক্ষুদ্র মেটে কুটীরে আসিয়াও যে শৈব্যা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া সব ভুলিয়াছেন—স্বামীর এই অবস্থা-বিপর্য্যয় দেখিয়া সে শৈব্যার আর ধৈর্য্য রহিল না।

স্বামীরই যদি এ অবস্থা হইল—তবে আর শৈব্যার কি রহিল? রাজভোগ, রাজসম্পদ্, রাজপ্রাসাদ—এ সকল শৈব্যা যে স্বামীর মুখ দেখিয়া তুচ্ছ মনে করিয়াছেন, সেই স্বামী আজ এতখানি বিপন্ন—শৈব্যা আর কি দেখিয়া বাঁচিবেন? শৈব্যা ধৈর্য্যচ্যুতা হইয়া তখন কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—শত চেষ্টা

করিয়া চক্ষুদ্বয়কে আর নিরস্ত রাখিতে পারিলেন না। তাহার অশ্রুজলে তখন হরিশ্চন্দ্রের বক্ষস্থল ভিজিয়া গেল। আহার-নিদ্রাও শৈব্যা একরূপ পরিত্যাগ করিলেন।

কিন্তু এইরূপ করিলে তো আর সময় বসিয়া থাকে না। সময় যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল। ক্রমে সেই ভীষণ দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিশ্চন্দ্র প্রতিদিনই দিন গণনা করিতেন, হঠাৎ একদিন ভোরে উঠিয়া শৈব্যাকে কহিলেন,—"শৈব্যা! আজই শেষ, আজ সব ফুরাইবে; তুমি, আমি, ঐ হতভাগা শিশু ও সূর্য্যবংশ আজ এক সঙ্গে ঋষিশাপে ভস্মীভূত হইবে। পক্ষকাল পূর্ণ হইবার আজ শেষ দিন!"

হরিশ্চন্দ্রের কথা শুনিয়া শৈব্যা শিহরিয়া উঠিলেন। শৈব্যাও কি দিন গণনা করেন নাই?—তিনিও করিয়াছেন। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রের এই কথাগুলিতে তাঁহার নিকট সমস্ত বিপদ্ যেন নূতন বিভীষিকায় ফুটিয়া উঠিল!
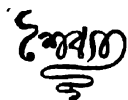
শৈব্যা স্বামীর হাতে ধরিয়া বলিলেন,—"চল, আজ দেবতার চরণে হত্যা দিতে যাইব। আমরা তো কিছু অপরাধ করি নাই, তবে কেন তাঁহারা আমাদিগকে এত শাস্তি দিবেন! নিশ্চয়ই তাঁহারা একটা উপায় করিবেন, নতুবা জগৎ মিথ্যা হইবে। চল, আমরা যথাসাধ্য অপর চেষ্টা করিয়াছ, এইবার এই চেষ্টা করি। আর দেরী করিও না, এ চেষ্টা অপেক্ষা আর কোন্ চেষ্টা মহত্তর?"

শৈব্যা এই বলিয়া সবলে স্বামীকে টানিয়া গৃহ হইতে বাহিরে লইয়া গেলেন। রোহিতাশ্ব মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া অবাক্ হইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল, কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। হরিশ্চন্দ্র স্তব্ধ, হতবুদ্ধির মত কতক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পত্নীকে দেখিলেন; তার পর, কি করেন, পত্নীর উপদেশই গ্রহণ করিলেন—পত্নীকে অবলম্বন করিয়া হরিশ্চন্দ্র দেবালয় অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তখন শৈব্যাকে যেন মূর্ত্তিমতী শক্তির মতই বোধ হইতে লাগিল।

পথে শৈব্যার উদ্ভ্রান্ত আকৃতির প্রতি চাহিয়া অনেকে স্তব্ধ হইয়া রহিল। এ কি ভয়ানক মূর্ত্তি! শৈব্যা এক হস্তে রোহিতাশ্বকে হৃদয়ে চাপিয়া ধরিয়াছেন, অপর হস্তে স্বামীকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাঁহার চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে। এমন অদ্ভুত দৃশ্য তো সচরাচর দৃষ্ট হয় না—কে এই উজ্জ্বলাকৃতি বামা?

শৈব্যা দেখিলেন, অনেকগুলি চক্ষু তাঁহার প্রতি নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; শৈব্যা তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। শৈব্যার নিকটে আজ চারিদিক্ শূন্য। শৈব্যা ভাবিতেছেন, "কি অদ্ভুত এই সংসার!—কি বিচিত্র ইহার গতি! এই সংসারে বাঁচিয়া সুখ কি? কি অভিপ্রায়ে ঈশ্বর এমন সংসারের সৃষ্টি করিলেন? যেখানে

পাপের শাস্তি নাই, পুণ্যের পুরস্কার নাই—সে সংসারের এমন কি প্রয়োজন? আজ বড় দুঃখে পড়িয়াই দেবতাকে ডাকিতে যাইতেছি, সকল অবলম্বন হারাইয়া দেবতার শরণ লইতে চলিয়াছি—আজ কি তিনি এ কাতর প্রার্থনা শুনিবেন না? অবশ্যই শুনিবেন—তাঁহাকে শুনিতেই হইবে—আমাদের যে অন্যোপায় নাই!"

মানব যখন সকল অবলম্বন হারাইয়া, সকল নির্ভর হারাইয়া নিজকে একান্ত নিঃসহায় বিবেচনা করে, তখনই বুঝি ঈশ্বরের প্রতি তাহাদের এতটুকু স্থির বিশ্বাস জন্মে, তখনই বুঝি শুধু তাহারা তাঁহার উপর এতটুকু নির্ভর করিতে সাহস পায়, তখনই বুঝি একমাত্র তাহারা জোর করিয়া বলিতে পারে, "তাঁহাকে এ প্রার্থনা শুনিতেই হইবে—আমাদের যে অন্যোপায় নাই!"

শৈব্যারও আজ সেই অবস্থা ঘটিয়াছে, তাই শৈব্যাও সেই বিশ্বাসে জোর করিয়া কহিতেছেন,—"ঈশ্বর যদি বাস্তবিক থাকেন, যদি তিনি সকলই দেখিতে পান,

সকলই শুনিতে পান, তবে তাঁহাকে এ কাতর প্রার্থনা শুনিতেই হইবে—না শুনিয়া তিনি থাকিতে পারিবেন না, নতুবা সব মিথ্যা হইবে—চল দেবালয়ে যাই।"

শৈব্যা এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে স্বামীকে লইয়া ক্রমে দেবমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেই সময় মন্দিরে অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছে! দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বরের চরণদর্শনাশায় কত দেশের কত কত লোক ছুটিয়া আসিয়াছে। শৈব্যা পতি ও পুত্র সহ সেই জনস্রোতের মধ্যে ঢুকিয়া দেবতার চরণে প্রণত হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহারা সেই ভাবে রহিলেন—উঠিলেন না। মন্দিরে কত লোক আসিতেছে, কত লোক যাইতেছে, কত লোক দেবতার সম্মুখে মাটিতে পড়িয়া লুটাইতেছে—কেহ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিল না। তাঁহারা অনেকক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া পরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া আসিলেন। কাশীতে দেবমন্দিরের অভাব নাই—দেবতারও অভাব নাই—
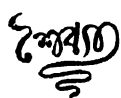
সেখান হইতে তাঁহারা অন্যান্য মন্দিরে দেবদর্শনে যাত্রা করিলেন। একে একে অনেক স্থান দর্শন হইলে তাঁহারা কাশীর প্রধান পবিত্রস্থান চক্রতীর্থে আসিয়া দেখা দিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া সকল কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক অন্যত্র যাইবেন, এমন সময় পার্শ্ব ফিরিতেই দেখেন,—সর্ব্বনাশ! যাহা ভাবিতেছিলেন, তাই!—বিশ্বামিত্র ঋষি হস্ত প্রসারিত করিয়া কঠোরাকৃতিতে দক্ষিণার জন্য তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন!

হঠাৎ ঋষিবরকে এই ভাবে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া—শৈব্যা, হরিশ্চন্দ্র ও রোহিতাশ্ব তিন জনেই চমকিয়া উঠিলেন। হায়, নির্দ্দয় তপস্বী কি ভ্রমেও এক দিন বিলম্ব সহিতে পারিলেন না? শৈব্যার হৃদয় আবেগে ও উদ্বেগে একবারে যেন ফাটিয়া যাইতে চাহিল। হরিশ্চন্দ্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন! আর শিশু রোহিতাশ্ব? তাহার অবস্থা আর কি বলিব? সেই ক্ষুদ্র কোমলহৃদয় শিশু-

টাঁর সংসারানভিজ্ঞ হৃদয়ে তখন কি ভাবের ঢেউ খেলিতেছিল—তাহা কে বলিবে ?

বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষণকাল তাঁহাদিগকে নীরবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গুরু-গম্ভীর স্বরে হরিশ্চন্দ্রকে কহিলেন, "রাজন্, আমার দক্ষিণা ?"

হরিশ্চন্দ্র কি উত্তর দিবেন ? তিনি নীরবে মস্তক অবনত করিলেন। আজন্ম সুখের ক্রোড়ে পালিত হরিশ্চন্দ্র ঋণযন্ত্রণা কাহাকে বলে, জানিতেন না। আজ মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা অনুভব করিয়া মৃত্তিকাতে মিশিয়া যাইতে চাহিলেন। মনে মনে কহিলেন,—"হায়, শাকান্নভোজী নিঃসহায় পথের ভিক্ষুক ও ঋণগ্রস্ত রাজা অপেক্ষা অনেক সুখী ! আজ যদি এই ঋণ না থাকিত, তাহা হইলে বারাণসীর এই পর্ণকুটীরে দীনবেশে থাকিয়াও কত সুখী হইতে পারিতাম !"

হরিশ্চন্দ্রকে এইরূপ নীরব থাকিতে দেখিয়া বিশ্বামিত্র আবার প্রশ্ন করিলেন,—"দাতা হরিশ্চন্দ্র ! নীরব রহিলে যে ? পক্ষকালের মধ্যে ব্রাহ্মণের ঋণ

পরিশোধ করিবে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে,—আজ তো পক্ষকাল অতীত হইতেছে—প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর।"

হরিশ্চন্দ্র তবু নিরুত্তর! তিনি কি উত্তর দিবেন? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজিলেন, দেখিলেন, কোথাও উত্তর নাই। একবার অতি কষ্টে অনুনয় বিনয় করিয়া ঋষিবরের নিকট হইতে একপক্ষ সময় গ্রহণ করিয়াছেন, আবার সময় চাহিলে হয়ত এখনি তপস্বীর কোপে ভস্মীভূত হইতে হইবে; অন্ততঃ ততদূর না হউক, নানাপ্রকার কঠোরোক্তি শুনিতে হইবে। ক্ষত্রিয়ের নিকট কটু বাক্য সহ্য করিবার মত আর কষ্টকর দ্বিতীয় কি? হরিশ্চন্দ্র ঋষির বাক্যের প্রত্যুত্তর করিলেন না—কেবলমাত্র সামান্য অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করিলেন,—"প্রভু!—"

ঋষিবর ক্রোধে কম্পিতস্বরে বলিলেন—"কি! আবার কি? আবার কি বলিবে? আমি ব্রাহ্মণ তপশ্চারী, যাগযজ্ঞাদি কার্য্যেই সর্ব্বদা আবদ্ধ, তোমার পেছনে পেছনে ঘুরিয়া বেড়াইবার তো আমার সময়

নাই। যাহা বলিতে হয় শীঘ্র বল, তপস্বীর আশ্রমের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া যে রাজধর্ম্ম পালন করিয়াছ, ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধ করিয়া তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিবে কি না, বল ?"

বিশ্বামিত্রের কণ্ঠে ব্যঙ্গের স্বর এখন স্পষ্টতর বাজিতে লাগিল। হরিশ্চন্দ্রের আর নীরব থাকিবার উপায় নাই—তিনি অতি কাতরভাবে একবার ঋষিবরের প্রতি ও একবার শূন্য আকাশের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—"ঋষিবর, কি জন্য আর এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? আপনার অজ্ঞাত তো কিছুই নয় ! এ দাসের অবস্থা কি আপনি অবগত নন্ ? কপর্দ্দক-শূন্য হইয়া এ কাশীধামে আসিয়াছি, নিঃসম্বল অবস্থায় স্ত্রী-পুত্র লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কোথায় সহস্র মুদ্রা পাইব ? কে আমায় দয়া করিয়া এ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবে ? যাহা দেবতার অসাধ্য, তাহা আমি মানুষ হইয়া কি প্রকারে সাধিব ? আমার তো চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটী হইতেছে না—আমার উপর সদয় হউন !"
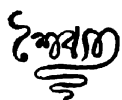
ঋষির চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তদ্রূপ ক্রোধ-কম্পিতস্বরে কহিলেন,—"ভাল, ভাল, তবু একটা স্পষ্ট কথা কহিলে; রাজন, তবু সন্তুষ্ট হইলাম! এতদিন মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ হইয়া, নিজ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার পেছনে পেছনে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, আজ এইখানে নিষ্কৃতি পাইলাম. তোমার রাজধর্ম্মের পরিচয়ও এইখানেই যথেষ্ট পাওয়া গেল. রাজন্!—আর আমাকে অন্বেষণে ভ্রমণ করিয়া বৃথা পরিশ্রান্ত হইতে হইবে না—তবে যাই। আশা করি, ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিয়া তুমি যে পাতক ক্রয় করিয়াছ, তাহার ফল অচিরাৎ ফলিবে।"

বিশ্বামিত্র চলিয়া যান, হরিশ্চন্দ্র কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন,—"শৈব্যা, শৈব্যা, কি করি, কি করি, সর্ব্বনাশ করিলাম! ঋষিবর চলিয়া যাইতেছেন—এখনি ব্রহ্মকোপে সূর্য্যবংশ রসাতলে যাইবে—কি উপায় হইবে? হা বিশ্বনাথ! কি অবস্থায়ই ফেলিলে!

কি পাপে এ শাস্তি বিধান করিয়াছ! কিরূপে এ বিপদের হস্ত হইতে মুক্তি পাইব—বলিয়া দাও।”

হরিশ্চন্দ্র উন্মত্তের মত চারিদিকে চাহিতে লাগি-লেন। শৈব্যাও উন্মাদিনীর ন্যায় আকাশ-পাতাল চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। এতক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তিনিও দুর্ভাগ্য পতির এই বিড়ম্বনা দেখিয়া-ছেন, ঋষিবরের প্রতি কথায় তাঁহারও প্রাণ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল, এইক্ষণে প্রিয় পতির আর্তনাদে তাঁহার হৃদয় একবারেই অবসন্ন হইয়া পড়িল। হরিশ্চন্দ্রের প্রাণে আর কত উদ্বেগ?—শৈব্যার হৃদয়ের ঝঞ্ঝার নিকটে বুঝি সেই ঝঞ্ঝা কিছুই নয়। শৈব্যা ভাবিতে লাগিলেন,—“হায়, শৈব্যার বক্ষ বিদার্ণ করিয়া দিলেও কি স্বামীর এ দুর্ভাগ্যের শেষ হয় না? শৈব্যার জীবনপাত করিলেও কি এ দৃশ্যের হস্ত হইতে স্বামীকে মুক্ত করা যায় না?”

শৈব্যা কি করিবেন—কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। পতি নীরব—ঋষিবর বার বার দক্ষিণা

চাহিতেছেন—শৈব্যা না বুঝিয়া সুঝিয়া এক কাজ করিলেন ;—হঠাৎ দৌড়িয়া যাইয়া ঋষিবরের পদমূল জড়াইয়া ধরিলেন।

ঋষিবর চলিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ পা আট্‌কাইয়া যাওয়ায় ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন—"ও কি করিতেছ মা ?"

শৈব্যা করুণস্বরে কহিলেন,—"প্রভু, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন—যাইবেন না, অগ্নি যাইবেন না, আমাদের উপায় করিয়া যা'ন। ব্রহ্ম-ঋণ পরিশোধিত না করিতে পারিলে আমাদের সর্ব্বস্ব যাইবে, নিজগুণে আমাদের উপর সদয় হইয়া কিরূপে এ ঋণ পরিশোধ হয়, আপনিই উপদেশ দিয়া যা'ন।"

বিশ্বামিত্র ব্যঙ্গের হাস হাসিলেন। আবার তাঁহার মুখমণ্ডল বিকৃত ভাব ধারণ করিল। সে ভাব দেখিয়া হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা শিহরিয়া উঠিলেন। রোহিতাশ্ব কম্পিতদেহে ছল ছল নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। লক্ষ্যশূন্য দৃষ্টি শূন্যে স্থাপিত

রাজপথে বিশ্বামিত্র, শৈব্যা, হরিশ্চন্দ্র ও রোহিতাশ্ব।

করিয়া শৈব্যা যেন অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে স্থাপিত কোনও গুপ্ততত্ত্বের আবিষ্কারের জন্য বারংবার বৃথা প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

মহর্ষি সরোষে কহিলেন,—"শেষকালে কি আমায় এই অভিনয় দেখিতে হইল?"

শৈব্যা,—দুর্ভাগিনী শৈব্যা উত্তর করিলেন—"প্রভু, স্বামী না বুঝিয়া সুঝিয়াই আপনার নিকট এমন গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন; উপায় নাই, তাঁহাকে রক্ষা করুন।"

ঋষিবর বলিলেন,—"মা! বুদ্ধিহীনার মত এ কি অনুরোধ করিতেছ? আমি রক্ষা করিবার কে? তোমরা যদি ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা না করিলে, তবে ধর্ম্মের মুখ হইতে আমি কিরূপে তোমাদিগকে রক্ষা করিব? তোমরা সহস্র মুদ্রা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে বলিয়া পণে আবদ্ধ, আমি ক্ষমা করিলেই কি তোমরা সে পণভঙ্গ-দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবে? তা পাইবে না মা, তা পাইবে না! আমি ক্ষমা করিলেও, এই পণ-ভঙ্গ হইতেই তোমাদের সর্ব্বনাশ হইবে—এই পণ-

ভঙ্গ-পাপেই তোমরা মজিবে! ধর্ম্মের দায় বড় দায়, ক্ষত্রিয়ের পণভঙ্গ বড় পাপ, মা! সে পাপের— সে দায়ের হস্ত হইতে কেউ তোমাদের উদ্ধার করিতে পারিবে না।—আমায় কেন বৃথা আবদ্ধ করিতেছ?"

তাইতো—কি সর্ব্বনাশ! শৈব্যা ভাবিলেন, তবে কি পৃথিবীতে কোন উপায় নাই? পরম ধার্ম্মিক, আজন্ম সত্যনিষ্ঠ, অযোধ্যার ভূপতি না বুঝিয়া সুঝিয়া একদিন একটা ভ্রম করিয়াছেন—এ ভ্রম কি কিছুতেই সংশোধন হইবে না? পতিব্রতার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। শৈব্যা আকাশ, পাতাল, ভূত, ভবিষ্যৎ—সমস্তই খুঁজিলেন, কোথায়ও কি কিছু উপায় নাই? শৈব্যা পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র—সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিলেন,—কোথায়ও কি এতটুকু ইঙ্গিত নাই? সহস্রমুদ্রা! সে কত?—তাহার মূল্য কত? কতটুকুর বিনিময়ে এতটুকু লাভ করা যায়? আজন্ম স্বচ্ছলতার ক্রোড়ে পালিতা শৈব্যার এইটুকু অনুসন্ধান করিবার কখনও

প্রয়োজন হয় নাই! আজ দৈব বিড়ম্বনায় সে প্রয়োজন হইয়াছে,—কেহ কি তাঁহাকে বলিয়া দিবে না?

শৈব্যা কাতর কণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"তবে কি হইবে প্রভু, তবে কি হইবে? আমাদের অবস্থা তো দেখিতেছেন, বিপদে পড়িয়া হিতাহিত বিবেচনাটুকুও হারাইয়া ফেলিয়াছি; দয়া করিয়া আপনিই বলুন, কি উপায়ে এ বিপদ্ হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে—আমরা প্রাণপণে তদনুরূপই কার্য্য করিব—একটুকুও কুণ্ঠিত হইব না, বলুন।"

শৈব্যা এই বলিয়া পুনঃ সমস্ত হৃদয়ের আবেগে বিশ্বামিত্রের পা জড়াইয়া ধরিলেন। এবার হরিশ্চন্দ্র ও রোহিতাশ্বও সেই সঙ্গে যোগ দিলেন। ঋষিবর বিষম বিব্রত হইলেন।

বিশ্বামিত্র কহিলেন,—"রাণি, এ কি অনুচিত আবদার? তপস্বীর আশ্রমের শান্তি নষ্ট করিবার সময় তো সে কথা ছিল না, তখন তো মহারাজের হৃদয়ে এ ভাবের বিকাশ দেখি নাই, তখন তো তিনি রাজ-

ধর্ম্মের দোহাই দিয়াই আপনাকে নির্ব্বিবাদ মনে করিয়াছিলেন, তবে আর এখন এ কথা কেন? অধমর্ণের ঋণ পরিশোধের চিন্তা করা কি উত্তমর্ণেরই কর্ত্তব্য? অধমর্ণের কি তাহাতে কোন দায়িত্বই নাই! মহারাজ নিজে মণিমাণিক্যাদি-পরিবেষ্টিত হইয়া যদি সে দায়িত্ব পালনে কুণ্ঠিত হইলেন, তবে ভিক্ষুক ঋষির তাহাতে উপদেশ প্রদানের প্রয়োজন?"

রাজা ও রাণী ঋষিবরের কথা শুনিয়া চমকিত হইলেন! এ কি ব্যঙ্গ! মণিমাণিক্যাদি! কোথায় সে মণিমাণিক্য? মহর্ষি কি শেষকালে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গোক্তি করিয়া তাঁহাদিগকে নির্য্যাতিত করিতে চাহিতেছেন? হরিশ্চন্দ্র চারিদিকে চাহিলেন।—শৈব্যাও সাশ্চর্য্য ভাবে, একবার ঋষিবরের দিকে ও একবার আপনার নিরাভরণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি চাহিয়া বিমর্ষভাবে কহিলেন, "প্রভু, স্ত্রী-পুত্র ব্যতীত তো মহারাজের সমীপে এমন কিছুই দেখিতেছি না, যাহার বিনিময়ে এই মুহূর্ত্তে সহস্র মুদ্রার সংস্থান হইতে

পারে। তবে এমন নিষ্ঠুর ব্যঙ্গোক্তি করিলেন কেন ?"

মহর্ষি স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া প্রশান্ত ভাবে কহিলেন—"লোকে বলে, স্ত্রী-পুত্রের মত ধন আর নাই—এই ধন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ !—আমার কথা ব্যঙ্গ নয় মা, ভাবিয়া দেখ।"

হঠাৎ শৈব্যার মনে একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল ; হরিশ্চন্দ্রও চমকিত হইয়া উঠিলেন ! সে বিদ্যুৎ বড় উজ্জ্বল—বড় তেজোময়। তাহাতে চক্ষু ধাঁধিয়া দেয়, কিন্তু সহসা কিছু বুঝিতে দেয় না। হঠাৎ রাজদম্পতীর আজ সেই অবস্থা হইল। তাঁহারা যে ইঙ্গিত চাহিয়াছিলেন, যেন সে ইঙ্গিত পাইলেন ; কিন্তু অনেক-ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। মহর্ষি তদ্রূপ আকাশের দিকেই চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার আকৃ-তিতে তখন এক অপূর্ব্ব রহস্যময় ভাব ব্যক্ত হইতেছিল।

অকস্মাৎ হরিশ্চন্দ্রের সংজ্ঞা হইল। তখন কি একটা কম্পনের মত তাঁহার সমস্ত দেহখানিকে অকস্মাৎ

নাড়িয়া দিয়া গেল। হরিশ্চন্দ্র আকুল নয়নে শৈব্যার দিকে চাহিলেন ; মণিহারা ফণী তাহার হৃত মণিটীর প্রতি যেমন সতৃষ্ণ ভাবে চায়, সেইভাবে চাহিলেন! শৈব্যার লক্ষ্যহীন নিস্প্রভ দৃষ্টির সহিত সেই দৃষ্টির মিলন হইতেই শৈব্যাও শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু সে অতি সামান্য কালের জন্য মাত্র। ক্ষণেক পরেই শৈব্যার চাঞ্চল্য অনেকটা দূরীভূত লইল। ক্রমে ক্রমে শৈব্যা অনেকটা স্থির, ধীর আকৃতি ধারণ করিলেন। একবার দুর্ভাগ্য পতির প্রতি ও একবার ঋষিবরের প্রতি কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শৈব্যা কহিলেন,—"প্রভু, বুঝিয়াছি, এতক্ষণে বুঝিয়াছি, আপনাকে শত. সহস্র ধন্যবাদ, এখনও উপায় আছে, এখনও ধর্ম্ম রক্ষা হইতে পারে!—একটি ইঙ্গিত চাহিয়াছিলাম, আপনি দয়া পূর্ব্বক তাহা দান করিয়াছেন—আপনার চরণে কোটী কোটী প্রণিপাত—এইবার আপনার আদেশ যথাসাধ্য পালন করিব।"

এই বলিয়া শৈব্যা উঠিলেন। উঠিয়া আকুল

নয়নে একবার চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। আর বেলা নাই, পশ্চিমাকাশে দিনমণি ঢলিয়া পড়িয়াছেন—ঋণপরিশোধের আর অতি অল্প মাত্র সময়ই বাকী, এই সময়মধ্যে যে করিয়া হউক ঋণ পরিশোধ করিতেই হইবে। শৈব্যা আর সময় নষ্ট করিতে পারিলেন না। শৈব্যা একবার পতির দিকে চাহিলেন, একবার পুত্রের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন, তারপর ব্যস্ত নয়নে অদূরে রাজপথের জন-কোলাহলের দিকে কি জানি কেন চঞ্চল ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

সেই সময় কাশীর পথ ঘাট লোকসঞ্চারে পূর্ণ হইয়াছে, ইতস্ততঃ লোক-জন ছুটাছুটি করিতেছে, সায়াহ্নের রক্তিম কিরণ বরণার ঘাটগুলি রঞ্জিত করিয়া দিয়া গোধূলির সঙ্গে কোলাকোলি দিতেছে, ভক্তেরা ভক্তি-সঙ্গীত গাইতে গাইতে পূজোপকরণ লইয়া বরণার ঘাটের দিকে চলিয়াছে। দু'প্রহরের উত্তপ্ত কিরণে যে পথ ঘাট এতক্ষণ অগ্নিতুল্য জ্বলিতেছিল, তাহা এখন মৃদু বায়ুসমাগমে বরণার শীকর-স্পৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে
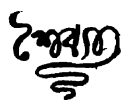
শীতল হইয়া যাইতেছে ; উত্তপ্ত বায়ুর ভয়ে এতক্ষণ যাহারা বাহির হইতে পারে নাই, তাহারা এখন ক্রমে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ অভিলাষানুসারে যথাতথা গমনাগমন করিতেছে। কেহ অর্থের সন্ধানে চলিয়াছে, কেহ পণ্য-দ্রব্য-সম্ভার লইয়া বাড়ী যাইতেছে, কেহ পণ্য কিনিবার জন্য ছুটিয়াছে

বাজারে স্তরে স্তরে কুসুম-সম্ভার শোভিতেছে, দেব-ভোগ্য মোণ্ডা-মিঠাই-এ হাট ভরিয়া গিয়াছে, কেহ বস্ত্র বিক্রয় করিতেছে, কেহ তণ্ডুল বিক্রয় করিতেছে, কেহ দাস দাসী বিক্রয় করিতেছে।

'নিকটেই দাস-দাসীর ব্যাপারী ডাকিতেছে,—কাহার দাস-দাসী চাই গো, ছুটে এস, বিকিয়ে গেলে আর পাবে না, ছুটে এস।"

কত লোক ছুটিয়া যাইতেছে, কত লোক কত কত অর্থব্যয়ে নিজ নিজ মনোমত দাস-দাসী ক্রয় করিয়া ভিড় ঠেলিয়া ঘরে ফিরিতেছে ; কেহ পাঁচশত মুদ্রাব্যয়ে কিনিতেছে, কেহ সাতশত মুদ্রাব্যয়ে কিনিতেছে,—শৈব্যা

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই সব দেখিলেন। তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!

শৈব্যা, আর কেন? আর অপেক্ষা কেন? তুমি ইঙ্গিত চাহিয়াছিলে, এই তো সেই ইঙ্গিত! উঠ, বুক চাপিয়া ধর; যাহা জীবনে ভাব নাই, স্বপ্নেও মনে স্থান দাও নাই, কখনও করিবার কল্পনা কর নাই, আজ তাহাই করিতে হইবে। করিতে হইবে যদি, উঠ, আর বিলম্ব কিসের? সঙ্কোচ করিতেছ? ভয় করিতেছ? ভয় কিসের? আরও বৃহত্তর ভয়ের কারণ তোমার এই বিলম্বের মধ্যে বিদ্যমান আছে, আর এক মূহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে হয় ত আর স্বামীকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। --তখন তোমার এ সঙ্কোচ, এ সম্ভ্রমের ভয়, এ বিচ্ছেদের বিভীষিকা কোথায় থাকিবে? তখন তোমার পতি কোথায় থাকিবেন, পুত্রই বা কোথায় থাকিবে, তুমিই বা কোথায় রহিবে? তখন তো এ বিচ্ছেদ ঘটিবেই ঘটিবে —তবে আর ইতস্ততঃ কেন?

শৈব্যা লুব্ধনয়নে, চঞ্চল অন্তরে সেই দাসদাসী-

বিক্রেতার দিকে চাহিয়া রহিলেন ;—হরিশ্চন্দ্র উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি সকলই দেখিতেছেন, সকলই বুঝিতে-ছেন ; কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন—"শৈব্যা ! শৈব্যা !"

শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রের দিকে চাহিলেন। অঞ্চলে অশ্রু-জল মুছিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন,—"স্বামিন্‌, প্রভু, আর কেন ? এইবার বিচ্ছেদের সময় আসিয়াছে ! এতদিন অভিমান করিতাম, মান-অভিমান করিয়া তোমায় দূরে দূরে রাখিতাম, কিন্তু সে কৃত্রিম বিচ্ছেদ মাত্র !—সে খেলা আজ ভাঙ্গিয়াছে, আজ সত্য সত্যই প্রকৃত বিচ্ছেদ আসিয়াছে—প্রভু, আজ আমায় বিদায় দাও।"

হরিশ্চন্দ্র বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার চক্ষুর জ্যোতিঃ নিষ্প্রভ হইয়া গেল, দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইল। শৈব্যা আজ একি কহিতেছে ? হরিশ্চন্দ্রের নয়নের মণি শৈব্যা, অযোধ্যার রাজমহিষী শৈব্যা, শত সহস্র ভোগবিলাসেও অভিমানিনী শৈব্যা আজ একি কহিতেছে ? হরিশ্চন্দ্র মাথায় হাত দিয়া নীরব রহিলেন।

বিশ্বামিত্র অধীরভাবে কহিলেন,—"মহারাজ, এ

শৈব্যার আত্মবিক্রয়।

অভিনয় তো আর দেখিতে পারি না। মহর্ষির ঋণ-পরিশোধে যদি এতই অনিচ্ছা, তবে আবার আমায় ডাকিয়া ফিরাইলে কেন? দেখিতেছি আমার চলিয়া যাওয়াই ভাল, প্রবঞ্চকের কথায় ফিরিয়াছিলাম, বেশ প্রতিফল পাইয়াছি!"

এই বলিয়া ঋষিবর আবার চলিয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

শৈব্যা এইবার ছিন্নতরুর মত ঋষিবরের পদমূলে আপনাকে নিক্ষিপ্ত করিলেন। কাতর কণ্ঠে কহিলেন, "প্রভু, যাইবেন না, যাইবেন না;—আমার দুর্ভাগ্য পতিকে এ পাপপঙ্কে ডুবাইয়া যাইবেন না, তাঁহাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন; বিপদে পড়িয়া তিনি কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছেন, আমি পতির ঋণ যথাসাধ্য শোধ দিব—আপনি তাঁহার উপর সদয় হউন। আমি থাকিতে কিছুতেই তাঁহার যশে কলঙ্ক স্পর্শ হইতে দিব না!—প্রভু! আমায় যথাতথা বিক্রয় করুন।"

বিশ্বামিত্র আশ্চর্য্য হইলেন। হরিশ্চন্দ্রের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"হরিশ্চন্দ্র! পত্নীর নিকটে, রমণীর নিকটে, আজ কর্ত্তব্য শিক্ষা কর।"

হরিশ্চন্দ্র কাতর ভাবে কহিলেন,—"প্রভু, সকল ছাড়িয়াছি, সকল সহ্য করিয়াছি; কিন্তু এ অভাব, এ দুঃখ তো সহ্য করিতে পারিব না! শৈব্যা দাসী!—হায়, এ দারুণ কথা কিরূপে সহ্য করিব? সহস্র দাস-দাসী যাহার পদসেবা করিয়াছে, সহস্র পুষ্পরেণু যাহার মুখের সৌরভ বৃদ্ধি করিয়াছে, দুগ্ধফেননিভ শয্যা, চামর-ব্যজন যাহার শ্রান্তি দূর করিতে পারে নাই—সে শৈব্যা দাসীপনা করিবে?—প্রভু, এ যে অসহ্য! আমার শত সহস্র আদরেও যাহার অভিমান দূর হয় নাই, সে শৈব্যা অন্যের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া মনস্তুষ্টি করিবে—এ যে অসম্ভব!"

বিশ্বামিত্র গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—কহিলেন,—"কি অসম্ভব মূর্খ! এখনও রাজ্যাভিমান—এখনও সম্পদ-ভিমান করিতেছ! একখণ্ড ভূমি যাহার দেহরক্ষার জন্য

উন্মুক্ত নাই, একগাছি তৃণ যাহার শয্যা-রচনার জন্য দুষ্প্রাপ্য, ব্রাহ্মণের ঋণভার যাহার গর্ব্বিত মস্তককে এখনও অবনত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার এখনও এ অভিমান, এ দ্বিধা কেন ? হরিশ্চন্দ্র, ভাব, একদিকে তোমার মান, অভিমান ও আত্মতৃপ্তি, অপর দিকে ব্রহ্মস্ব-হরণরূপ মহাপাপ, অনন্ত নরক, চির-অশান্তি—কাহাকে বরণ করিবে,—ভাব ! আর আমি অপেক্ষা করিতে পারি না—সত্বর উত্তর দাও।”

বিশ্বামিত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হরিশ্চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। হরিশ্চন্দ্র নীরব রহিলেন। তখন শৈব্যা ঋষিবরের পদযুগল পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর নিকটে আসিলেন।

হরিশ্চন্দ্র সেইরূপ মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া ছিলেন, শৈব্যা করযোড়ে কহিলেন,—“প্রভু, এখন আর সে অভিমান কেন ? এখন তো আর আমি রাজরাণী নই, আর তো এখন আমার সে সহস্র দাসদাসী নাই, আর তো এখন রাজরাজেশ্বর আমার প্রণয়-দেবতা
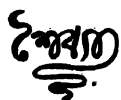
নহেন,—তবে আর সে সুখস্বপ্ন দর্শনে ফল কি ? প্রভু, সে স্বপ্ন বিস্মৃত হও। মনে কর, আমরা এখন ভিঁখারী ; মনে কর, আমরা এখন অভিশাপগ্রস্ত মনুষ্যাধম ; মনে কর, আমাদের মিলনের আশা এখন আর এ সংসারে নহে, ওই পরলোকে !—আমায় অনুমতি দাও।"

শৈব্যা উদ্বিগ্ন নয়নে হরিশ্চন্দ্রের মুখপ্রতি উত্তরের প্রত্যাশায় চাহিয়া রহিলেন।

হরিশ্চন্দ্র কাতর দৃষ্টিতে শৈব্যার মুখ প্রতি চাহিলেন। সে কমনীয়, চিরমধুর মুখখানা দেখিতেই, তাহার বিচ্ছেদ-কল্পনা হরিশ্চন্দ্রকে প্রবল বন্যার মত গ্রাস করিতে আসিল। হরিশ্চন্দ্র উদ্‌ভ্রান্তভাবে কহিলেন,—"শৈব্যা, শৈব্যা, কখনও না—প্রাণ থাকিতে কখনও সে কথা আমি মুখে আনিতে পারিব না। কি ছার এই সংসার ! কি ছার এই বংশ-গৌরব ! শৈব্যা, সব তুচ্ছ ! এই নশ্বর অস্তিত্বের, আমার নিকট, কোনও মূল্য নাই ! আমার নিকট একমাত্র সত্য তুমি ! তোমার সুখের জন্য আমি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইব না

প্রাণ থাকিতে তোমায় আমি দাসী করিতে পারিব না।"

শৈব্যা কতকক্ষণ নীরব রহিলেন। একবার দুর্ভাগ্য পতির দিকে ও একবার পুত্রের দিকে চাহিলেন। পতি উন্মাদ, পুত্র কাঁদিতেছে—শৈব্যার হৃদয়ে প্রবল ঝড় উঠিল। কিন্তু শৈব্যা অবিলম্বেই আপনাকে স্থির করি-লেন। চক্ষে জল আসিতেছিল, শৈব্যা তাহাকে সবলে অৰ্দ্ধেক পথে ফিরাইয়া দিলেন। অপত্য-স্নেহের একটা প্রবল ঢেউ তাঁহার কোমল হৃদয়টীর উপর দিয়া দ্রুত চলিয়া গেল, শৈব্যা হটিলেন না,—বুক পাতিয়া তাহার গতি অবরুদ্ধ করিলেন; হাত পা কাঁপিতেছিল, শৈব্যা আত্মধিক্কারে তাহাদিগকে সংযত করিলেন।

শৈব্যা কহিলেন,—"প্রিয়তম, দেবতা, স্বামিন্, তবে ক্ষমা করিও। আমি থাকিতে তোমার কলঙ্ক হইবে, আমার জন্য তোমার সর্ব্বস্ব যাইবে, প্রাণ থাকিতে আমি তা দেখিতে পারিব না। তোমার অনুমতি না লইয়া আজ যদি আমি আমায় বিক্রয় করি, তাহাতে যে পাপ
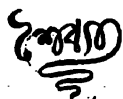
স্পর্শিবে, তোমাকে অম্লান রাখিবার জন্য তাহা আমি সাদরে গ্রহণ করিলাম। প্রভু, দেবতা! আমার ধর্ম্ম তুমি, আমার সুখ তোমার সুখে, আমার মান গর্ব্ব তোমার মান গর্ব্বে। আজ যদি তোমার মাথা হেঁট হয়, তোমার চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শে, তবে রাজরাণীর তুল্য জাঁকজমকে থাকিয়াও আমি সুখী হইতে পারিব না—গর্ব্ব অনুভব করিব না; কিন্তু তোমায় যদি আজ মুক্ত করিতে পারি, তোমায় যদি আজ কলঙ্কশূন্য রাখিয়া যাইতে পারি, তবে দাসীপনা করিয়াও আমার অনন্ত সুখ, অনন্ত গর্ব্ব হইবে—আমি চলিলাম।"

এই বলিয়া শৈব্যা পতিকে প্রণাম করিয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন। নয়নের কোণে অবাধ্য অশ্রুস্রোত সঞ্চিত হইয়াছিল, ফিরিতেই শত ধারায় বহিল। শৈব্যা অতি গোপনে পতি-পুত্রের অজ্ঞাতসারে সে অশ্রু অঞ্চলে মুছিয়া ফেলিয়া দ্রুত রাজপথের সমীপে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজপথ দিয়া অজস্র লোক-স্রোত চলিয়াছে। শৈব্যা তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—

"মহাশয়, আপনাদিগের কি কাহারও দাসীর প্রয়োজন আছে ? তবে আসুন, এইখানে এক দাসী আছে, আসিয়া তাহাকে গ্রহণ করুন। তাহার প্রভু অর্থাভাবে বড় বিপন্ন হইয়াছেন, দাসীকে ক্রয় করিয়া তাঁহাকে বিপন্মুক্ত করুন।"

শৈব্যা একে একে অনেককে এ কথা কহিলেন, কিন্তু কেহই তো তাঁহার সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। শৈব্যা বারবার আকাশের দিকে চাহিতে লাগিলেন। অবশেষে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে ছুটিয়া আসিলেন।

ব্রাহ্মণ একটী দাসী ক্রয় করিবার জন্য অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতেছিলেন, কিন্তু বাজারের সেই বিরাট জনতা ভেদ করিয়া কিছুতেই বিক্রেতার নিকট পৌঁছিতে পারিতেছিলেন না ; শৈব্যার কাতর আহ্বান শুনিতে পাইয়া দৌড়িয়া আসিয়া কহিলেন, "কে দাসী আছে মা ? আমি ক্রয় করিব, আমার একটী দাসীর প্রয়োজন। ভিড় ঠেলিয়া বাজারে পৌঁছিতে পারিতেছি না, আমায় দেখাইয়া দাও, আমি ক্রয় করিব।"

শৈব্যা কহিলেন "প্রভু, আমিই সেই দাসী—আমিই দাসীপনা করিব, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমায় গ্রহণ করুন।"

ব্রাহ্মণ চমকিত হইয়া একটু সরিয়া গেলেন। তাঁহার উৎফুল্ল মুখখানি হঠাৎ আবার নৈরাশ্যের অন্ধকারে আবৃত হইল। ব্রাহ্মণ দুঃখিত ভাবে কহিলেন,—"মা, তুমি তো দাসীর মত নও!"

হরিশ্চন্দ্র ডাকিলেন—"শৈব্যা! ফের, ফের; আমি যেমন করিয়া পারি মহর্ষির ঋণ শোধ করি—শৈব্যা ফের।"

বিশ্বামিত্র গর্জ্জিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—"কাপুরুষ, নারকী! চাহিয়া দেখ, আকাশের দিকে চাহিয়া দেখ, তারপর পত্নীকে নিবারণ করিও। ওই ডুবন্ত রবির রক্তিম কিরণ-মালা পশ্চিমাকাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ওই প্রদোষের অন্ধকার তোমার সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে বিকট বদন বিস্তারে গ্রাস করিতে আসিতেছে, ওই অদূরে দেব-মন্দিরের চূড়ায় উজ্জ্বল-রজতচ্ছটা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। আর দুই দণ্ড পরে ওই নিষ্প্রভ রজতচ্ছটার শেষ চিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে তোমারও বংশের চিহ্ন একেবারে পৃথিবী

হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। হরিশ্চন্দ্র! এখনও সতর্ক হও।"

ঋষিবরের সেই ভীষণ বাক্যে হরিশ্চন্দ্র স্তব্ধ হইয়া গেলেন, বালক রোহিতাশ্ব কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় পিতাকে সজোরে জড়াইয়া ধরিল। শৈব্যা ব্যস্ত নয়নে একবার প্রিয় পতির ও একবার প্রিয় পুত্রের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "প্রভু, অবিশ্বাস করিবেন না, অবিশ্বাস করিবেন না। আমার স্বামী বিপদ্গ্রস্ত, এখনি সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা চাই, তাঁহাকে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা দিয়া এখনি আমায় গ্রহণ করুন। আমি দাসীর সকল কার্য্যই করিতে পারিব—নিঃসঙ্কোচে আমায় গ্রহণ করুন।"

ব্রাহ্মণ কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না—একবার চারিদিকে চাহিলেন। শৈব্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন। শৈব্যার কথা তাঁহার যথাযথ বলিয়া অনুমিত হইল। কিন্তু অন্য চিন্তায় এবার তাঁহার মন উৎকণ্ঠিত হইল। সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা!

কৈ তত অর্থ তো আমার নিকটে নাই। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন "হায়, হায়, পাইয়াও এমন দাসীটীকে বুঝি শেষকালে অর্থাভাবে ছাড়িয়া যাইতে হইল!" প্রকাশ্যে কহিলেন—"মা, তত অর্থ তো আমার নিকটে নাই। আমার নিকট শুধু পাঁচ শত সুবর্ণ মুদ্রা আছে। বলতো ঐ অর্থে তোমায় ক্রয় করিতে পারি। এতদধিক দিতে আমি অসমর্থ।"

শৈব্যা আবার চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। কিন্তু শৈব্যার কি এখন চিন্তারও আর অবসর আছে?--শৈব্যা আকাশের দিকে চাহিলেন। দাঁড়াও দাঁড়াও দিনমণি, আর একটুকু দাঁড়াও, অত তাড়াতাড়ি করিতেছ কেন? তোমার গতির উপর আজ তোমার বংশের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে! তোমার বংশ রক্ষার জন্য—তোমার বংশের কীর্ত্তি রক্ষার জন্য আজ একটু ধীরে যাও—আর একটু মন্থর গতিতে চল—একটু অবসর দাও।"

হায়, পশ্চিম গগনের মেঘখণ্ডগুলি রক্তিম হাসি মাখিয়া উত্তরে তাঁহাকে উপহাস করিল মাত্র। দিনমণি

যেমন স্তরে স্তরে নামিয়া যাইতেছিলেন, তেমনি নামিতে লাগিলেন। শৈব্যা আর চিন্তা করিবারও অবসর পাইলেন না। দৌড়িয়া হরিশ্চন্দ্রের নিকটে যাইয়া তাঁহার পদমূলে বসিয়া যুক্তি করে কহিলেন,—"প্রভু, দেব, শত চেষ্টা করিয়াও তোমায় বাঁচাইতে পারিলাম না—বড় দুঃখ রহিল। তথাপি আমি আমার যথাসাধ্য করিতেছি—ক্ষমা করিও। আজ আমি এই ব্রাহ্মণের নিকটে দাসীত্ব গ্রহণ করিলাম ; ইঁহার নিকট হইতে এখনই পাঁচ শত মুদ্রা লইয়া ঋষিবরকে প্রদান কর, তারপর তাঁহার পদে ধরিয়া আরও কিছুকালের জন্য সময় চাও। হয়ত তিনি এ প্রার্থনা শুনিলেও শুনিতে পারেন। তোমার জন্য অপরের দাসীপনা গ্রহণ করিতেছি ; ভাবিও না, প্রভু, আমার ইহাতে কষ্ট বোধ হইবে ; তোমার কার্য্যে দেহ পাত করিতে পারিলে দাসীর যে আনন্দ, পৃথিবীতে অপর কিছুতেই সে আনন্দ নাই ! দুঃখ এই, তোমার বিচ্ছেদ-রূপ এমন একটা দারুণ কষ্ট শিরে ধারণ করিয়াও

আজ তোমায় সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত দেখিয়া যাইতে পারিলাম না! কিন্তু সে কথায় আর ফল কি? প্রভু, আর নয়, আর আমার অপেক্ষা করিবার উপায় নাই—আমায় বিদায় দাও!"

শৈব্যা চক্ষের জলে বক্ষ সিক্ত করিয়া ধীরে ধীরে পতিকে প্রণাম করিলেন, তারপর রোহিতাশ্বকে ক্রোড়ে লইয়া বারবার উন্মাদিনীর মত তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। হায়! আজ এই দুরন্ত পুত্রস্নেহ কোথা হইতে আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল! শৈব্যা তো শত চেষ্টা করিয়াও পুত্রকে আর বক্ষ হইতে নামাইতে পারিতেছেন না, রোহিতাশ্বও আজ এই অসময়ে এমন আকুলভাবে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিতেছে কেন?

কিন্তু শৈব্যা তো আর পারেন না—সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িতেছিল—শৈব্যা পতির বিপদের কথা স্মরণ করিয়া জোর করিয়া পুত্রকে মৃত্তিকায় নামাইয়া দিলেন। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "বাবা, মহারাজের কাছে যাও। আমি চলিলাম, তোমার

দুঃখিনী মাকে আর স্মরণ করিও না—আজ হ'তে মহারজই তোমার—"

শৈব্যা কথা সমাপ্ত করিতে পারিলেন না, অশ্রু-স্রোত আসিয়া তাঁহার বাক্‌শক্তিকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল। শৈব্যা অতিকষ্টে সে দুর্দ্দমনায় আবেগকে কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া ব্রাহ্মণের দিকে ফিরিলেন।

ব্রাহ্মণ ইঙ্গিত পাইয়া প্রফুল্ল বদনে সেই পাঁচ শত মুদ্রা হরিশ্চন্দ্রের নিকটে রাখিয়া শৈব্যাকে লইয়া চলিলেন।

রোহিতাশ্ব হঠাৎ ফিরিয়া দেখিল, মা চলিয়া যায়—পশ্চাৎ হইতে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিল,—"মা!"

হায় হতভাগ্য শিশু!

শৈব্যা চোখের জল অঞ্চলে মুছিয়া আবার ফিরিলেন, কহিলেন "বাবা, কেন আবার ডাকিতেছ? মা তোমার চলিল, আজ হইতে মহারাজই তোমার পিতা মাতা। আর আমায় ডেকো না বাবা—"

অবোধ শিশু সকল বোঝে না, কিন্তু তাহার মাকে আর দেখিতে পাইবে না, কে যেন তাহার অন্তর

হইতে তাহাকে এইটুকু বুঝাইয়া দিল। সে দৌড়িয়া যাইয়া মাতার অঞ্চল ধরিয়া কাঁদিয়া কহিল, "মা, মা! আমি তোমার সঙ্গে যাবো মা, আমায় ফেলে যেয়ো না মা!"

শৈব্যা রোহিতাশ্বকে কোলে লইলেন। মুখ চুম্বন করিয়া কি প্রবোধ দিতে যাইবেন, হঠাৎ শিশির-সিক্ত কুসুমের মত ঝর ঝর করিয়া তাঁহার নয়ন দু'টী অশ্রু বর্ষণ করিয়া সকল কথা রুদ্ধ করিয়া দিল। সেই কান্না দেখিয়া রোহিতাশ্বও কাঁদিয়া উঠিল।

সেই সময় ঋষিবরের কঠোর গর্জ্জন আবার শ্রুত হইল। ঋষিবর মহারাজকে কর্কশ কণ্ঠে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! এই অভিনয় আর কতক্ষণ দেখিব? আর একদণ্ড মাত্র সময় অবশিষ্ট আছে —আকাশের দিকে চাও। এখনও আমি সম্পূর্ণ মুদ্রা পাই নাই।—আরও পঞ্চ শত মুদ্রা এই সময়ের মধ্যে তোমায় সংগ্রহ করিতে হইবে, তাহার কি উদ্যোগ করিতেছ?"

শৈব্যা সেই কথা শুনিয়া আবার রোহিতাশ্বকে নামাইয়া রাখিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে পলাইতে চাহিলেন; কিন্তু আবার রোহিতাশ্ব "মা মা" বলিয়া তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইল। হায়, অভাগিনী এবার মাটিতে বসিয়া পড়িলেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"মা, আমি তো আর থাকিতে পারিতেছি না! এরূপ ভাবে তোমার যে না আসাই উচিত ছিল।"

শৈব্যা চমকিত হইলেন। পাছে ব্রাহ্মণের সংকল্প পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় কহিলেন, "না না, প্রভু, কিছু মনে করিবেন না। এই আমি আপনার সঙ্গে যাইতেছি, চলুন। বাবা রোহিতাশ্ব, ফের বাবা, তোমার পিতার কাছে যাও,—আমি ব্রাহ্মণের সহিত না গেলে যে তাঁহার বিপদ্—অবাধ্য হ'য়ো না।"

রোহিতাশ্ব পিতার দিকে চাহিল। যাহা দেখিল তাহাতে শিহরিয়া উঠিল। দেখিল, যে মস্তক কাহারও নিকটে নত হয় নাই, তাহা আজ কি এক গুরুভারে

মৃত্তিকা চুম্বন করিতেছে। বিস্মিত নয়নে রোহিতাশ্ব আবার মাতার দিকে চাহিল। কিন্তু দেখিল মাতা নাই—মাতা পলায়ন করিয়াছে।

রোহিতাশ্ব উন্মত্তের মত দৌড়িল। "মা! মা! দাঁড়াও মা, দাঁড়াও নিষ্ঠুর মা! মা, আমায় ফেলিয়া যাইও না—নিষ্ঠুর মা! দাঁড়াও।"

রোহিতাশ্ব আবার যাইয়া শৈব্যাকে জড়াইয়া ধরিল. আবার শৈব্যাকে ফিরিতে হইল।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"মা, এই কি তোমার দাসীপনা?"

ব্রাহ্মণ এইবার শৈব্যাকে হাতে ধরিয়া লইয়া যাইতে চাহিলেন, রোহিতাশ্ব মাতাকে ধরিয়া সজল নয়নে পিতার দিকে চাহিয়া নীরবে তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা চাহিতে লাগিল।

শৈব্যা ব্রাহ্মণের প্রতি করযোড়ে কহিলেন,— "পিতঃ, একটা অনুরোধ রাখুন, এই বালককেও আপনার সঙ্গে লউন। আমি যে এ বন্ধন কিছুতেই ছিন্ন করিতে পারিতেছি না!"

ব্রাহ্মণ চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন,"সে কি কথা—তা কিরূপে করিব? আমার তো তেমন অবস্থা নয় মা—এ অবোধ শিশুকে লইয়া যাইয়া আমি কি খাওয়াইব?"

শৈব্যা কাতরে কহিলেন,—"সে জন্য আপনি ভাবিবেন না—শিশুকে আমি খাওয়াইব। আমার যে দৈনিক আহারের বরাদ্দ হইবে, তাহা হইতে আমি শিশুকে ভাগ দিব। কাজের বেলা উভয়েই কাজ করিব।"

ব্রাহ্মণ ভাবিলেন,—"না জানি কাহার মুখ দেখিয়াই ঘুম হইতে উঠিয়াছিলাম।" মনের ভাব মনে চাপিয়া রাখিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন "চল মা, চল, যেমন তোমার অভিপ্রায়! না বুঝিয়া কার্য্য করিয়াছি, আর কি করিব! কিন্তু কথাটা মনে রাখিও—যেন ভুলিও না।"

শৈব্যা অশ্রুজল অঞ্চলে মুছিয়া রোহিতাশ্বকে কোলে লইয়া কহিলেন,—"প্রাণান্তেও একথা ভুলিব না, এ কথা বিস্মৃত হইলে আমার মহাপাতক হইবে;—অনুগ্রহ করিয়া আর একটু অপেক্ষা করুন, আমি আমার প্রভুর নিকটে একটা কথা কহিয়া আসি।"

এই বলিয়া শৈব্যা আবার হরিশ্চন্দ্রের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; মহারাজ যেখানে উদ্‌ভ্রান্তভাবে বসিয়া একদৃষ্টে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া ছিলেন, সেখানে আসিয়া ধীরে ধীরে পুত্রকে পতির পদতলে স্থাপন করিয়া কহিলেন, "প্রভু, স্বামিন্, বড় আহ্লাদ করিয়াই এক দিন রোহিতাশ্বকে তোমার হস্তে সঁপিয়া দিয়াছিলাম, এই দুঃখের সময়ও আমার একমাত্র নয়নমণিকে তোমারই চিরসঙ্গী করিয়া দিয়া কথঞ্চিৎ তোমার দুঃখের লাঘব করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু গ্রহ আমার তাহাতেও বিরূপ হইল দেখিতেছি, মায়ার বন্ধন বড় বন্ধন—সন্তানের স্নেহ বড় স্নেহ, দুর্ভাগ্য শিশুকে আমাকেই ভিক্ষা দাও। স্বামিন্, তোমায় একা রাখিয়া যাইতে প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু তবু প্রার্থনা করিতেছি, রোহিতাশ্বকে আমায়ই ভিক্ষা দাও। নইলে রোহিতাশ্ব বাঁচে না, আমিও বুঝি বাঁচি না। স্বামিন্, অভাগিনীর অনুরোধ রাখ।"

কি সুন্দর মূর্ত্তি! মাতৃস্নেহের কি অপূর্ব্ব বিকাশ! বিলাসিনী রমণীর পদ্মপলাশ লোচনযুগল হইতে

অবিরত স্নেহজল বিগলিত হইতেছে, সেই পূত অশ্রু-রাশি ফুল্ল-মল্লিকা-কুসুমটীর মত একটী মধুর ক্ষুদ্র শিশুর মস্তক অজস্রধারে সিক্ত করিয়া দিতেছে!—এ দৃশ্য যে না দেখিয়াছে, তাহাকে বুঝাইতে পারিব না। সেই অতি দুঃখের, অতি বিপদের মধ্যেও সেই দৃশ্য দেখিয়া হরিশ্চন্দ্র মোহিত হইলেন। হরিশ্চন্দ্র কতদিন শৈব্যাকে দেখিতেছেন, দেখিয়া কত মোহিত হইয়াছেন; কিন্তু এমন সুন্দর যেন আর দেখেন নাই, এমন মুগ্ধ বুঝি আর হয় নাই! হায়, এ মোহিনা মূর্ত্তি লইয়া মায়াবিনী শৈব্যা এই বিদায়ের মুহূর্ত্তে কেন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন—এই মোহিনী শৈব্যাকে, কি করিয়া হরিশ্চন্দ্র আজ আজীবনের তরে বিপদ্-সাগরে ভাসাইয়া দিয়া যাইবেন? হরিশ্চন্দ্র উত্তর করিতে পারিলেন না, তাঁহারও নয়নকোণে অশ্রু দেখা দিল। হরিশ্চন্দ্র পূর্ব্ববৎ নীরব রহিলেন।

আবার ঋষিবর গর্জ্জিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—"রাজন্, আর একবার আকাশের দিকে চাও।"

হরিশ্চন্দ্রের যেন নিদ্রাভঙ্গ হইল—শান্ত শিষ্ট অচঞ্চল বারিরাশির উপরে কে যেন একখণ্ড বৃহৎ ইষ্টক নিক্ষেপ করিল। হরিশ্চন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন,—কি সর্ব্বনাশ!—আর তো বিলম্ব নাই! ক্ষণপরেই সূর্য্যদেব অস্তাচলাবলম্বী হইবেন! হরিশ্চন্দ্র কি করিবেন, অকস্মাৎ স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। একবার আকাশের দিকে চাহিলেন, একবার পৃথিবীর দিকে ও একবার শৈব্যার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার মস্তক উত্তেজিত হইয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া হরিশ্চন্দ্র কহিলেন,—"শৈব্যা, শৈব্যা, তবে তাই হোক্! তুমিই ধন্যা, তুমিই সার্থক, তোমার কীর্ত্তিই তবে জগতে অক্ষয় হোক্। অদৃষ্ট অপরাজেয়, অজেয়; কীর্ত্তিই অক্ষয়! শৈব্যা! আজ তুমি যে কীর্ত্তি রাখিলে, তাহা চিরকাল জগতে বিদিত থাকিবে! শৈব্যা, তবে বিদায়, ও হো হো— শৈব্যা, বিদায়!"

হরিশ্চন্দ্র দুই হস্তে আপনার মস্তক আবৃত করিলেন। সাশ্রুনয়নে শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ

করিলেন—আর স্বামীর দিকে চাহিতে পারিলেন না; জোরে রোহিতাশ্বকে হৃদয়ে চাপিয়া ধরিয়া একবার পশ্চিম গগনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—"প্রভু, তবে চলিলাম, বিলম্বে দাসীকেই ব্রহ্মশাপের কারণ হইতে হইবে; এখনও একদণ্ড বেলা আছে, দাসীর কথা বিস্মৃত হইয়া যাহাতে ব্রহ্মশাপ হইতে রক্ষা পাও, তাহাই কর। দাসী দাসী মাত্র, আমার মত কত দাসী কত সময় তোমার কত স্থানে মিলিবে, সে জন্য চিন্তা কেন? সে জন্য চিন্তা করা তোমার শোভা পায় না! প্রভু, আজ যদি ব্রহ্ম-ঋণে অব্যাহতি পাও, যদি আবার কখনও দিন ফিরিয়া আসে, আমার মত শত দাসী গ্রহণ করিয়া এ দাসীকে বিস্মৃত হইও; প্রভু, তবে বিদায়!"

সেই অভিমানিনী শৈব্যা এই!

শৈব্যা এই কথা বলিয়া অঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিয়া ব্রাহ্মণের পদানুসরণ করিলেন। যত দূর চক্ষু যায় হরি-শ্চন্দ্র মৃত্তিকাপুত্তলিবৎ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেই চিরজীবনের সঙ্গিনী আজ চিরজীবনের জন্য তাঁহার

নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছে ; এইমাত্র যাহাকে জীবনের চির-সঙ্গিনী ভাবিয়াছেন, সে এখন চিরজীবনের জন্য অদর্শন হইতেছে ; আজ সূর্য্যোদয়ের সময় যাহাকে অবলম্বন করিয়া সকল দুঃখ ভুলিবেন ভাবিয়াছিলেন, সেই শেষ অবলম্বন—জীবনের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন আজ চিরজীবনের জন্য তাহার নির্ভর হইতে খসিয়া পড়িতেছে !

হরিশ্চন্দ্র চাহিয়া রহিলেন, অনিমেষ নয়নে—অনিমেষ দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন ! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, আপন, পর সকল বিস্মৃত হইয়া সেই প্রেমময়া রমণীর শেষ চিহ্নটুকুর দিকে চাহিয়া রহিলেন ! কাঠের পুতুলি যেমন লক্ষ্যভ্রষ্ট দৃষ্টিতে কি জানি কেন একদিকে চাহিয়া থাকে, তেমনি নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে হরিশ্চন্দ্রও সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন !

ক্রমে শৈব্যার শেষ পদশব্দ কাশীর জনকোলাহলের মধ্যে মিশিয়া গেল, ক্রমে শৈব্যার শেষ চিহ্নটুকু দূরে রাজপথের ধূলিপটলের সঙ্গে মিলাইয়া গেল, ক্রমে সন্ধ্যার ধূসর আলোক আসিয়া চারিদিকের দৃশ্যগুলির

উপর একটা যবনিকা ফেলিবার সূচনা করিল; তখন হরিশ্চন্দ্রের চেতনা হইল। হরিশ্চন্দ্র তখন হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া এক লম্ফে রাজপথে পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন,—"আর কেন? কে কোথায় আছ, ছুটে এস। দাসী তো বিকিয়ে গেল, এবার কে দাস নিবে গো ছুটে এস! আমার সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিব, এস কে কোথায় আছ, ছুটে এস।"

উন্মত্তের মত হরিশ্চন্দ্র কাশীর দিগ্দিগন্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে ছুটিতে লাগিলেন।

বিশ্বামিত্রও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

ব্রাহ্মণগৃহে শৈব্যা ।

ব্রাহ্মণগৃহে শৈব্যা

(১)
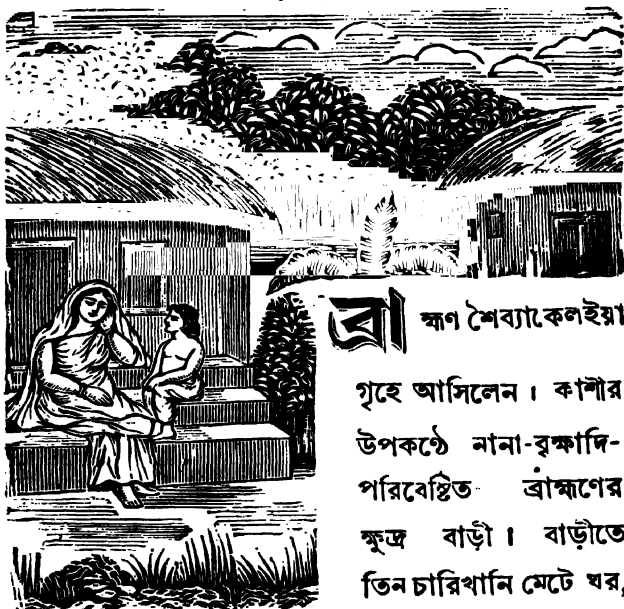
ব্রাহ্মণ শৈব্যাকে লইয়া গৃহে আসিলেন। কাশীর উপকণ্ঠে নানা-বৃক্ষাদি-পরিবেষ্টিত ব্রাহ্মণের ক্ষুদ্র বাড়ী। বাড়ীতে তিন চারিখানি মেটে ঘর, সেই তিন-চারি খানি ঘরের একখানির দাওয়ায় আসিয়া শৈব্যা পুত্রকে কোলে করিয়া বসিলেন।

হায়, শৈব্যা আজ কোথায় আসিয়াছেন? স্বপ্নেও

কি এমন তমসাচ্ছন্ন জীবনের কল্পনা শৈব্যার সুখশান্তি-পূরিত মনটীকে একদিনের জন্যও পীড়িত করিয়াছিল? শৈব্যা কি কল্পনায়ও এমন অদ্ভুত অবস্থা-পরিবর্ত্তনের কথা একদিনও মনে স্থান দিতে পারিয়াছিলেন? কৈ, শৈব্যার তো তা মনে হয় না!

শৈব্যা ভাবিতে লাগিলেন, "একি স্বপ্ন,—না সত্য?" শৈব্যা চারিদিকে চাহিলেন; নিজের প্রতি, রোহিতাশ্বের প্রতি দৃষ্টি করিলেন,—কৈ, সকলই তো সেই! সেই রোহিতাশ্ব! সেই শৈব্যা! সেই আকাশ, বায়ু, নক্ষত্র! সেই চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, সকলই সেই। তবে শৈব্যার আজ চরাচরে সকলই এত নূতন বোধ হইতেছে কেন? শৈব্যার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, শুধু একজনের অভাবেই আজ তাঁহার নিকট সমস্ত সৃষ্টি নূতন হইয়া গিয়াছে। আজ শৈব্যার চারিদিকে সকলই আছে, শুধু হরিশ্চন্দ্র নাই। হায়, সূর্য্য না থাকিলে জগৎ কি পরিচিত হয়? শৈব্যার হৃদয়রাজ্যের সূর্য্যও আজ অস্তমিত হইয়াছে, শৈব্যার নিকটেও আজ চরাচর অপরিচিত!

শৈব্যা করতলে বামগণ্ড স্থাপিত করিয়া স্তব্ধ অন্তরে বাহিরের অন্ধকারের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, কি এক মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস তাঁহার সমস্তটা হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া দিয়া বার বার বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। শৈব্যার অন্ধকার মনটীর মধ্যে তখন অতীত জীবনের কত কথা, কত ঘটনা, কত সুখস্বপ্ন, স্তরে স্তরে ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহা কে বলিবে ?

শৈব্যা শৈশবের কথা ভাবিলেন।

শৈশবে পিতা মাতার ঘরের একমাত্র আদরিণী কন্যা—কত স্নেহে, কত যত্নে, কত মান-অভিমানের ভিতরে বর্দ্ধিত হইয়াছেন, একটু সামান্য অসুখ-অশান্তি হইলে কত জন তাঁহার সেবাশুশ্রূষার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে—সেই দিন গুলি আজ কোথায় গেল ?

শৈব্যার মনে হইল, তখন বুঝি শৈব্যার এ কষ্ট সহিবার ক্ষমতা ছিল, তখন বুঝি শৈব্যা নিজকে নিজে লইয়াই পরিপূর্ণ থাকিতে পারিত; মাতার ভালবাসা, পিতার স্নেহ, পৌরজনের আদর-যত্নের ত্রুটী হইলেও

তখন বুঝি শৈব্যার নিজকে এত অসহায় মনে হইতে না ;
—হায়, সে সময় শৈব্যার এ দুর্দ্দশা হইল না কেন ?—
তাহা হইলে তো শৈব্যা কতকটা সহ্য করিতে পারিত ;
আজ এই বিপদের ক্রোড়ে, জীবনের থাসর্ব্বস্বকে
পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া শৈব্যা কিরূপে ধৈর্য্য ধারণ
করিবে ? আজ এই নয়নের মণি, স্নেহের পুত্তলি
রোহিতাশ্বকে শৈব্যা কিরূপে পরান্নপালিত, পরমুখা-
পেক্ষী দেখিবে ?

শৈব্যার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে চাহিল।

তারপর শৈব্যার বিবাহিত জীবনের কথা মনে পড়িল।

সেই সময়ের কথা, সেই বিবাহ-রজনী, সেই
বিবাহিত জীবনের প্রেমধারাপ্লাবিত মধুর দিনগুলির
কথা মনে হইতেই শৈব্যা একবারে চিন্তা-সাগরে
ডুবিয়া গেলেন।

স্বয়ংবরের পূর্ব্বের সেই কয়েকটা দিন তাঁহার
হৃদয়কে কি মধুধারায়ই না সিক্ত করিয়াছিল ! ভাবী
ভর্ত্তার সহৃদয়তা, পুরুষকার ও বীরত্বের কাহিনী তাঁহার

হৃদয়ে কত সুখ-স্বপ্নই না জাগাইয়া তুলিয়াছিল। বিবাহ-রজনীতে কত সঙ্কোচে, কত আনন্দে, কত হৃদয় ভরা আবেগেই না শৈব্যা মূর্ত্তিমতী ভালবাসার মত এক ছড়া চন্দনচর্চ্চিত কুসুম-হার কম্পিত হস্তে লইয়া হৃদয়-সর্ব্বস্বের কমনীয় কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছিলেন,—শৈব্যার সেই কথা মনে পড়িল। শৈব্যা একবারে বিহ্বল হইয়া গেলেন।

তারপর সেই প্রথম মিলন! প্রথম প্রেমসম্ভাষণ!—কি করিয়া তাঁহাদের প্রেম ক্রমে ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়াছিল, কি করিয়া শৈব্যা ক্রমে ক্রমে একটী সম্পূর্ণ অপরিচিত, অপরিজ্ঞাত সুন্দর আগন্তুককে হৃদয়রাজ্যে বরণ করিয়া লইয়াছিল, সহকারের পৃষ্ঠে মাধবীলতিকাটীর মত দিনে দিনে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, শেষটা একবারেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল—সেই সব কথা শৈব্যার মনে পড়িতে লাগিল!—শৈব্যার মাথা ঘুরিতে লাগিল।

সর্ব্বশেষে সেই বিবাহিত জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ—দাম্পত্য-জীবনের পরিপক্ক দিনগুলির কথা মনে আসিল।

রোহিতাশ্বের জন্ম, রোহিতাশ্বের শৈশব, ক্ষুদ্র কোমল শিশুটীকে মধ্যে রাখিয়া পতি-পত্নীর মান-অভিমানের অভিনয়,—সব কথা শৈব্যার মনে পড়িল। তখন আর শৈব্যার কিছুতেই ধৈর্য্য রহিল না, শৈব্যার চক্ষে অবিরল জলধারা বহিল। রোহিতাশ্বের মুখের উপরে সেই ধারা ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িতে লাগিল। বালক হঠাৎ চমকিয়া উঠিল।

রোহিতাশ্ব কাঁদিয়া বলিল,—"মা, বাবা ?—"

হায়, অবোধ শিশু, না বুঝিয়া আজ হঠাৎ তুমি এ কি কোমল তন্ত্রীতে ঘা দিয়া বসিলে ?

তখন শৈব্যার কাতর ক্রন্দনে বুঝি পাষাণও দ্রবীভূত হইয়া যায় !

তখন আর শৈব্যার নিজ সুখ-দুঃখের কথা মনে রহিল না। কোথায় স্বামিন্, কোথায় তুমি প্রভু, তোমার চরণে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইলে শৈব্যার যাতনা রাখিবার স্থান থাকে না, সেই তুমি, সেই প্রিয় হইতে প্রিয়তর, বাঞ্ছিত হইতেও অধিকতর বাঞ্ছিত, দুর্ল্লভ হইতেও আরও দুর্ল্লভ,

ব্রাহ্মণ-গৃহে চিন্তামগ্না শৈব্যা।

শৈব্যার হৃদয়-সর্ব্বস্ব, আজ কোথায় রহিলে ? আজ কি অবস্থায় আছ ? একদিনও এ দাসীর সেবা-শুশ্রূষা ব্যতীত তোমার তৃপ্তি সাধিত হয় নাই, আজ কে তোমার শোক-দুঃখতাপিত হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতেছে ? দাসী তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু একবার আসিয়া বলিয়া যাও, তুমি ভাল আছ, তুমি সুখে আছ ; আমি সেই কথা মনে করিয়া আমার উত্তপ্ত জীবন শীতল করি—এ অবোধ শিশুকে সান্ত্বনা দেই ; এস, একবার এস !

শৈব্যা আর ভাবিতে পারিলেন না, কথা কহিতে পারিলেন না, কেবল কাঁদিতে লাগিলেন ! রোহিতাশ্বও মাতার হৃদয়ে মুখ লুকাইয়া লুকাইয়া নীরবে অনেক অশ্রু-বিসর্জ্জন করিল—ধরাতলে অজস্র মন্দাকিনী-স্রোত বহিল !

হায়, সেই ক্রন্দনের মধ্যেও কি স্বর্গীয় সুধা লুক্কায়িত ছিল—তাহা কে বলিবে !

ব্যা—দুর্ভাগিনী শৈব্যা—কত কাল এইরূপ ক্রন্দন করিতেন, তাহা বলা যায় না ; কিন্তু কাহার কর্কশ স্বরে হঠাৎ তাঁহার ক্রন্দন থামিয়া গেল ! শৈব্যা শুনিলেন,—তাঁহার সম্মুখে অদূরে দাঁড়াইয়া কে চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"মা, এ কে মা ?"

শৈব্যা তাড়াতাড়ি আপনাকে সংযত করিয়া লইলেন।

ব্রাহ্মণের পরিবার ক্ষুদ্র। এক গৃহিণী ও এক পুত্র ব্যতীত তাঁহার সংসারে অপর কেহ ছিল না। পুত্র গঙ্গারাম এতক্ষণ পাড়ায় পাড়ায় কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, এক্ষণে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া শৈব্যাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল !

এমন সুন্দরী রমণী গঙ্গারাম বুঝি আর কখনও

দেখে নাই,—দাসদাসীর ভিতরে দূরে থাক্, সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরেও কখনও দেখে নাই! গঙ্গারাম দেখিল, তাঁহার রূপের ছটায় তাহাদের অন্ধকার বাড়ী খানা যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! গঙ্গারাম বিস্ময়ে, আনন্দে ও কতকটা ভয়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"মা, এ কে মা?"

ব্রাহ্মণী অপর ঘরে কার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন, উত্তরে কহিলেন,—"ও বাছা, দাসী।"

দাসী! গঙ্গারাম্ ক্ষণিক অবাক্ হইয়া রহিল; তারপর হঠাৎ তাহার মুখ চোক্ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। গঙ্গারাম হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল,—"বেশ দাসী!" তারপর দৌড়িয়া মার কাছে আরও কি জিজ্ঞাসা করিতে গেল।

হায়, এই গণ্ডমূর্খ যুবকের মুখেও আজ শৈব্যাকে এই আত্মসুখ্যাতি শুনিতে হইল! যে হৃদয় অযোধ্যা-নরেশের শত সহস্র আবদারেও নিজের সৌভাগ্য-তৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত মনে করে নাই, সে হৃদয় আজ এই

অজ্ঞাত যুবকের সুখ্যাতি শ্রবণে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল !

রাত্রি গভীরা হইলে নীবার ধান্যের পক্ক তণ্ডুল সামান্য ব্যঞ্জনাদিবেষ্টিত হইয়া শৈব্যার আহার্য্যরূপে আসিয়া উপস্থিত হইল। শৈব্যা নিদ্রিত শিশুকে একটু একটু করিয়া তাহা ভোজন করাইলেন, নিজে একটুকুও খাইলেন না। আয়াস-রচিত নানা সুস্বাদু মিষ্টান্নও যে রোহিতাশ্বের একদিন মুখরোচক হয় নাই, সে রোহি-তাশ্ব আজ সে সামান্য আহার্য্য অতি পরিতৃপ্তির সহিত গলাধঃ করিল। শিশুর ভুক্তাবশিষ্ট ফেলিয়া দিয়া শৈব্যা আবার নিজ অদৃষ্ট চিন্তা করিতে বসিলেন।

ব্রাহ্মণ-পরিবারের নৈশ কর্ত্তব্য নিঃশেষিত হইলে একখানি কুশনির্ম্মিত সামান্য মাতুর ও একখানি ছিন্ন কন্থা শৈব্যার শয্যারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিল। সেই মলিন শয্যার উপর দৃষ্টি করিয়া শৈব্যা একটুকুও উদ্বিগ্ন হইলেন না! শৈব্যার মনে আহার-নিদ্রার কথা তখন কি একটুকুও স্থান পাইতেছিল? শয্যা যেমন

আসিয়াছিল, তেমনি পড়িয়া রহিল ; কতকগাছি শুষ্ক কুশপত্রের উপর দেহ রক্ষা করিয়া শৈব্যা পুত্রকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। রোহিতাশ্ব অল্পকাল মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল;—কিন্তু শৈব্যা ? হায়, কে বলিবে তখন শৈব্যার অস্তিত্ব কোথায় ? সেই রক্তমাংসের শরীর পরিত্যাগ করিয়া শৈব্যার মনটী তখন কল্পনার কোনও ভীষণ তমোময় রাজ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিল। স্বামীর সেই বিদায় কালের অবনত মস্তক, সেই যাতনাক্লিষ্ট কাতর কণ্ঠস্বর, সেই করুণ আহ্বান—কেবলই শৈব্যার সম্মুখে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল ! কে জানে এখন তাঁহার আরও কি দুৰ্দ্দশা ঘটিয়াছে ; শৈব্যা সর্ব্বস্ব দিয়াও স্বামীকে সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত করিয়া আসিতে পারেন নাই—কে জানে মহর্ষির ক্রোধে এখন তাঁহার আরও কত কি দুর্গতি হইয়াছে ! শৈব্যা তো সুখে-দুঃখে একটু আশ্রয় পাইয়াছে, কে জানে তাঁহার জীবন সর্ব্বস্ব এইটুকু আশ্রয় হইতেও বঞ্চিত কি না !

গভীর নিশীথে এইরূপ কত কথা ভাবিতে ভাবিতে সেই দুঃখময় চিন্তাস্রোতের কোন্ ঢেউটির আঘাতে, হঠাৎ শৈব্যা ধারণার গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া অবসন্ন দেহে ঘুমাইয়া পড়িলেন! দুর্ভাগিনী সেই সর্ব্বসন্তাপ-হারিণী নিদ্রার রাজ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বপ্নের ক্রোড়ে প্রিয়তমের প্রতিমূর্ত্তিখানি দেখিয়াছিল কি না, কে বলিতে পারে?

(৩)

পরদিন দিনমণি চারিদিক্ প্রফুল্লিত করিয়া উদিত হইলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষ-লতা--পাতা—সকলই হাসিয়া উঠিল, কিন্তু শৈব্যার হৃদয়ের অন্ধকার-টুকু ঘুচিল কৈ ?

অকস্মাৎ ঘুম হইতে উঠিয়া শৈব্যা ভাবিলেন,—এ কি দুঃস্বপ্ন ? আজ কত বৎসর—কত বৎসর শৈব্যা প্রিয়তমের আশ্রয় ব্যতীত রজনী বঞ্চনা করেন নাই—কই সে প্রিয়তম তো আজ তাঁহার নিকটে নাই! অবিলম্বেই চারিদিকের বাস্তব সামগ্রী শৈব্যাকে নিষ্ঠুর সত্য জ্ঞাপন করিল! শৈব্যা আবার অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

শয্যাত্যাগান্তে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপিত করিয়া

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-পত্নী আসিয়া শৈব্যাকে দৈনিক-গৃহ-কার্য্যাদি বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

ঘর-বাড়ী ঝাড় দেওয়া, ব্রাহ্মণীর সেবাশুশ্রূষা করা ও যজ্ঞের কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করা ইত্যাদির ভার শৈব্যার উপর রহিল; ফুলতোলা, দূর্ব্বাতোলা ও পূজোপকরণাদি সংগ্রহ করার ভার রোহিতাশ্বের উপর পড়িল। বালক রোহিতাশ্ব সকল দেখিয়া শুনিয়া এখন আর শব্দটী করিল না; কেবল নীরবে মাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মাতা পুত্রের কার্য্যভার যথাসম্ভব নিজের স্কন্ধে কাড়িয়া লইয়া পুত্রকে কথঞ্চিৎ নিরুপদ্রব করিতে চাহিলেন; কিন্তু তাহাতেও বালকের কষ্ট সম্যক্ ঘুচাইতে পারিলেন না।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-পত্নীর ব্যবহার শৈব্যার নিকট তত অপ্রীতিকর হইল না; তাঁহারা শৈব্যার আকৃতি ও প্রকৃতি দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন,—শৈব্যার এ দাসীত্ব চির-কালের নহে;—তাঁহারা তাঁহার উপর যথাসাধ্য সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু গঙ্গারামের ব্যবহার

শৈব্যার নিকটে বড় তিক্তবোধ হইতে লাগিল। গঙ্গারাম তাঁহাকে দেখিলেই অবাক্ হইয়া থাকে, নানা ভঙ্গি করিয়া পাণ্ডিত্য দেখাইতে চায়, শৈব্যা তাহার নিকট হইতে পলাইতে পারিলে বাঁচেন।

ব্রাহ্মণ-পুত্র গঙ্গারাম টোলে সংস্কৃত পড়ে, কিন্তু গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাত ও তর্জ্জন-গর্জ্জন ভিন্ন উপদেশ পরিপাক করা তাহার বড় অভ্যাস নাই। গঙ্গারামের যত বিদ্যা বাড়ীতে পিতা-মাতার নিকটে। বাড়ীর ত্রিসীমানা অতিক্রম করিলেই যে গঙ্গারাম মূর্খ, বলদ, ষণ্ড, বাড়ীর ত্রিসীমানার ভিতরেই সেই গঙ্গারাম মহাপণ্ডিত—তাহার বিদ্যার তুলনা নাই।

গঙ্গারাম যখন বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া আহারে-বিহারে সংস্কৃত ভাষার মুক্তাপাত করে, তখন তাহার সরল পিতা-মাতা ভাবেন, আহা ছেলের রাজত্বে আর অন্নের দুঃখ থাকিবে না!

গঙ্গারাম কথায় কথায় সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি করে, খাইতে খাইতে সন্ধিবৃত্তির সূত্র বলে, গরুর ঘাস

যোগাইতে যোগাইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকে—"পশু ছিল আলয় পশ্বালয়, তৃণ ছিল অন্ন তৃণান্ন, দুগ্ধ ছিল আধার দুগ্ধাধার"—ইত্যাদি ইত্যাদি—

পিতা-মাতার আর সুখের অবধি থাকে না !

আজ দু'প্রহরের ভোজনকালে যখন গঙ্গারাম গৃহে আসিয়া মাতাকে কহিল,—"মাতঃ, অন্নং দেহিং মে কিঞ্চিতং," তখন ব্রাহ্মণী আনন্দে একবারে উৎফুল্ল হইয়া তাড়াতাড়ি শৈব্যাকে ডাকিয়া কহিলেন, —"মা, ছেলের জন্য শীঘ্র ঠাঁই কর, দেখিও যেন বিলম্ব করিও না—বাছার আমার তাহা হইলে পড়া হইবে না।" শৈব্যা তাড়াতাড়ি গৃহিণীর অনুজ্ঞা পালন করিতে গেলেন।

আসনবিস্তার-রতা শৈব্যার দিকে চাহিয়া গঙ্গারাম হতবুদ্ধি হইয়া গেল। গঙ্গারামের আর যেন ক্ষুধা-তৃষ্ণা মনে রহিল না। গুরুমহাশয়ের নিকট গঙ্গারাম অনেক দেবদেবী ও অপ্সরাদের গল্প শুনিয়াছে। গঙ্গারাম ভাবিল, শৈব্যা বুঝি সেই অপ্সরা ! গঙ্গারাম কেবলই তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

আসন বিস্তার করিয়া দিয়া শৈব্যা চলিয়া যায়, গঙ্গারাম কহিল,—"ঝি, তুমি লেখা পড়া জান ?" শৈব্যা কি কহিবেন ? শৈব্যা মস্তক অবনত করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন—কোনও উত্তর করিলেন না। গঙ্গারাম আবার কহিল,—"না জানতো, আমি তোমায় কিঞ্চিৎ শিখাইব। তুমি বেশ বুদ্ধিমতী—বেশ শিখিতে পারিবে।"

শৈব্যা গঙ্গারামের আচার-ব্যবহার দেখিয়া বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু কি করিবেন ? নস্তমস্তকে বিনা বাক্যব্যয়ে ব্রাহ্মণীর নিকট চলিয়া গেলেন।

গঙ্গারাম উত্তর না পাইয়া মনে মনে বড়ই অসন্তুষ্ট হইল।

কিন্তু গঙ্গারাম সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে। সেই-দিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে, সারাদিন গৃহকার্য্য করিয়া শৈব্যা যখন পুত্রকে বক্ষে লইয়া বারান্দায় যাইয়া একটু বিশ্রাম করিতে বসিলেন, তখন দেখিলেন, ঘরের অদূরে বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া একখানি পুথি হস্তে কে তাঁহাকে

লক্ষ্য করিয়া উঁকি ঝুঁকি দিতেছে! শৈব্যার চিনিতে বাকী রহিল না—সে আর কেহ নহে—স্বয়ং গঙ্গারাম! শৈব্যা তাড়াতাড়ি আপনাকে সংযত করিয়া, গৃহমধ্যে যাইয়া অর্গল দিলেন।

আর গঙ্গারাম?—গঙ্গারাম আর তখন কি করিবেন?—উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজ ঘরে ফিরিয়া গেলেন। রাগে ও ক্ষোভে তাঁহার শরীর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল।

দাসীর এত অহঙ্কার কেন?

শ্মাণের আলয়ে এইরূপ সুখে-দুঃখে শৈব্যার কাল যাইতে লাগিল। কাল যায়, কাল থাকে না ; সুখে যাউক দুঃখে যাউক, যায়,থাকে না,—শৈব্যার-ও কাল যাইতে লাগিল। ক্রমে এক বৎসর দু'বৎসর করিয়া বহুদিন অতিবাহিত হইল—শৈব্যার ললিত দেহরত্ন হইতে একে একে সমুদয় রাজচিহ্ন মুছিয়া গেল !

শৈব্যার নিকট তখন রাজরাণীর ঐশ্বর্য্য, রাজরাণীর সৌভাগ্য-সম্পদ্ সকলই স্বপ্ন ! অতীতের সে উজ্জ্বল স্মৃতিখানি তখন শৈব্যার অন্ধকারময় হৃদয়কে মিটিমিটি আলোকিত করিয়া অস্পষ্ট ক্ষীণ নক্ষত্রের মত দূর হইতে জ্বলিতে লাগিল !

আর হতভাগ্য রোহিতাশ্ব ? হায়, রোহিতাশ্বকে

তখন আর কে রাজকুমার বলিয়া চিনিতে পারে ? দরিদ্রতার কালিমা আসিয়া তখন তাহার উজ্জ্বল সুকুমার দেহ-রত্নটীকে একবারেই মলিনতার আবরণে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, শৈশবের সুখ-স্মৃতিটুকু তখন তাহার নিকটে স্বপ্ন হইতেও অলীক ! যে রোহিতাশ্ব এককালে শত-সহস্র দাস-দাসীর আদর-যত্নকেও তুচ্ছ মনে করিত, সে রোহিতাশ্বের ভাগ্যে এখন গঙ্গারামের তর্জ্জন-গর্জ্জন ভিন্ন অন্য ব্যবস্থা নাই ! বয়সের সঙ্গে-সঙ্গেও রোহিতাশ্বের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

আকাশচ্যুত নক্ষত্রটীর মত অকস্মাৎ দারিদ্র্যের ক্রোড়ে পতিত হইয়া যখন রোহিতাশ্ব প্রথমেই মাতৃ-ক্রোড়টুকু হারাইয়া ফেলিয়াছিল, অবোধ শিশু তখন বড় উৎপাতই করিয়াছিল। রোহিতাশ্ব তখন কিছুতেই প্রবোধ মানিতে চাহিত না, সে কিছুতেই শৈব্যাকে ছাড়িয়া দিত না। শৈব্যা মহা বিপদ্‌গ্রস্ত হইতেন। একদিকে প্রভু ও প্রভু-পত্নীর আদেশ, অপর দিকে প্রাণাধিক পুত্রের আকুল ক্রন্দন !—হায়, অভাগিনীর তখন কি দারুণ সঙ্ক-

টই না উপস্থিত হইত। তখন গঙ্গারামের কর্কশ তর্জ্জন-গর্জ্জনে তাঁহাদিগের আর লাঞ্ছনার অবধি থাকিত না। কিন্তু এখন?—এখন আর সে দিন নাই!

দিনে দিনে, কালে কালে রোহিতাশ্ব এখন সকলই বুঝিয়াছে। এখন আর রোহিতাশ্ব মাতৃক্রোড়ের জন্য উন্মত্ত হয় না। সে মাতৃক্রোড় এখন তাহার নিকট অযোধ্যার রাজসিংহাসনাপেক্ষাও দুর্ল্লভ! গভীর রাত্রিতে সাংসারিক কার্য্যাদি হইতে প্রত্যাবৃত্ত না হইলে এখন আর রোহিতাশ্ব মাতাকে স্পর্শ করিতেও সাহস পায় না। মাতা সকলই দেখেন, সকলই বোঝেন, কিন্তু কি করিবেন? তাঁহার শুধু চক্ষের জলই সার হয়! শিশুও মাতার কষ্ট বুঝিয়া যথাসাধ্য তাঁহাকে নানা ছলে ভুলাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু মাতার নিকট সন্তানের সুখ-দুঃখ গোপনের প্রয়াস —সে বৃথা চেষ্টা মাত্র! শৈব্যার নিকট তা গোপন থাকে না। শৈব্যা সব বোঝেন!

রোহিতাশ্ব এখন আর কাঁদে না; অতি যাতনা হইলেও কাঁদে না। দীন-দুঃখিনী মাতার মলিন

মুখ খানিতে একটী হাসির রেখা অঙ্কিত দেখিবার জন্য বালক এখন কতরূপ আনন্দের অভিনয় করে, ক্ষুধায় উদর দগ্ধ হইয়া গেলেও হাসিমুখে কত কথা কয়, কাজ করিতে করিতে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিলেও, নাচিতে নাচিতে দৌড়িয়া প্রভুর আজ্ঞা পালন করে ; কিন্তু এত করিয়াও কি মাতার দুঃখ দূর করিতে পারে ? কৈ ?—তবু তো শৈব্যার: মলিন মুখখানি প্রফুল্লিত হইয়া উঠে না !—শৈব্যার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে না !

হায়, শৈব্যার মুখে আজ আর কোথা হইতে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিবে ? শৈব্যার কত দুঃখ ! শৈব্যার তো এই এক দুঃখ নয় ! শৈব্যা রাজসম্পদ্, রাজ্যসুখ, রাজ-গর্ব্ব সকলই ভুলিয়াছে বটে,কিন্তু শৈব্যা তো হরিশ্চন্দ্রকে ভুলিতে পারে না ! একে দারুণ প্রেম, তার উপর আবার প্রতিদিন প্রতি মূহূর্ত্তে রোহিতাশ্বের আকৃতি সে স্মৃতি জাগাইয়া দেয় —শৈব্যা ভাবিতে ভাবিতে উন্মাদিনী হন, চারিদিক্ অন্ধকার দেখেন, কি, করিয়া হতভাগিনী হাসিবে ?—পুত্রকে ভুলাইবার জন্যও শৈব্যা হাসিতে পারেন না।

রোহিতাশ্বের প্রাণ মাতার এই দুঃখে কেবলই নীরবে ক্রন্দন করে।

কিন্তু মাতা-পুত্রের সর্ব্বপ্রধান বিপদ্ গঙ্গারামকে লইয়া! গঙ্গারামের জন্য শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের সুখ-শান্তির শেষ চিহ্নটুকুও বর্ত্তমান নাই—গঙ্গারামের জন্য তাঁহাদিগের এতটুকুও নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই! গঙ্গারাম কেবলই শৈব্যাকে শাস্ত্রোপদেশ শুনাইতে ব্যস্ত!

গঙ্গারাম বলে, "শৈব্যা, তুমি লেখাপড়া জান না, অজ্ঞ; আমার নিকট কিছু শাস্ত্রোপদেশ শোন, অনেক উপকার পাইবে।"

শৈব্যা বলেন,—"মহাশয়, আমি নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক, আমার শাস্ত্রোপদেশ শুনিয়া কি হইবে? বরং রোহিতাশ্বকে একটু একটু করিয়া শোনাও,—আমি কৃতার্থ হইব।" —গঙ্গারাম ক্ষেপিয়া রাগিয়া লাল হইয়া যান। হায়, নির্ব্বোধ স্ত্রীজাতির কি হইবে? তাহারা শাস্ত্রকথা শুনিতে চায় না! বিশেষতঃ, গঙ্গারামের মত পণ্ডিতের মুখে যাহাদের শাস্ত্রকথা শুনিবার স্পৃহা নাই, তাহাদিগকে

যে গঙ্গারাম কি উপাধিতে ভূষিত করিবে, তাহা খুঁজিয়াই পান না!

শৈব্যার কথায় গঙ্গারামের উপদেশ দানের স্পৃহা সহজে দূর হইল না। দিনে দিনে গঙ্গারাম শৈব্যাকে নানা প্রকার বুঝাইতে লাগিলেন। টোলে গুরুমহাশয় যত বলিতে লাগিলেন, বিদ্যার সহিত গঙ্গারামের সম্পর্ক দিন দিন কমিতেছে, গৃহে গঙ্গারাম শৈব্যাকে বুঝাইতে লাগিলেন, বিদ্যার সহিত গঙ্গারামের সম্পর্ক তত বেশী বাড়িতেছে! টোলে গঙ্গারামের বিদ্যার সহিত যত বেশী মনোমালিন্য ঘটিতে লাগিল, গৃহে গঙ্গারাম বিদ্যার তত বেশী অনুরাগ দেখাইতে লাগিলেন। শৈব্যা যত গঙ্গারামকে, তাঁহাকে ছাড়িয়া রোহিতাশ্বকে বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, গঙ্গারাম তত রোহিতাশ্বকে ছাড়িয়া শৈব্যাকে উপদেশ দিতে ব্যগ্র হইতে লাগিলেন—রোহিতাশ্বের প্রতি তাঁহার ক্রোধও তত বাড়িতে লাগিল!—দেখিয়া শুনিয়া শৈব্যা প্রমাদ গণিলেন।

শৈব্যা—অভাগিনী শৈব্যা—এ বিপদের কি প্রতিকার করিবেন?

গঙ্গারাম প্রভুর একমাত্র পুত্র! গঙ্গারাম প্রভুর একমাত্র আদরের সন্তান!—তাহার বিরুদ্ধে দাসীর এ অভিযোগ কে শ্রবণ করিবে?

শৈব্যা উপায়ান্তর না দেখিয়া আগত্যা ব্রাহ্মণকুমারের সঙ্গে একটু একটু করিয়া বাক্যালাপ বন্ধ করিলেন। কিন্তু ইহাতে গঙ্গারাম আরও অসন্তুষ্ট হইলেন!

গঙ্গারাম যখন দেখিল, শৈব্যা তাহার উপর এতটা উদাসীন, এতটা অমনোযোগী—গঙ্গারামের তখন আর রাগের সীমা রহিল না। গঙ্গারাম তখন ক্ষেপিয়া রাগিয়া উন্মত্তবৎ হইল। তখন গঙ্গারামের ধৈর্য্যের বাঁধ টুটিল।

শৈব্যার এত গর্ব্ব কেন? দাসী, পরান্নভোজী, আজ্ঞাবাহিকা শৈব্যার এত গর্ব্ব!—গঙ্গারাম ভাবিয়া পায় না ইহার কারণ কি? গঙ্গারাম নিজে যাচিয়া তাহাকে শাস্ত্রোপদেশ দিতে গেল, শৈব্যা অম্লান বদনে সে দান প্রত্যাখ্যান করিল—এত অবজ্ঞা!—কিন্তু সে কথাও যাউক, শৈব্যা শাস্ত্রকথা না শোনে নাই শুনুক, শৈব্যার পারলৌকিক উন্নতির জন্য যে গঙ্গারামের বড় বেশী মাথা-ব্যথা ছিল, তা নয়, কিন্তু শৈব্যা তাহার সহিত কথা কহি-

তেই অসম্মত কেন? শৈব্যা এমন সুন্দর, কিন্তু শৈব্যা কথা কহে না কেন? গঙ্গারাম দাস-দাসীকে এ পর্য্যন্ত তর্জ্জন-গর্জ্জন না করিয়া কথা কহে নাই, মার-ধর ছাড়া তাহাদের প্রতি অন্য শিষ্টাচার করে নাই; কিন্তু শৈব্যার সহিত সে সর্ব্বদা হাসিয়া কথা কহিয়াছে, সে শৈব্যার এত তাচ্ছিল্য, এত অনাদর!—গঙ্গারাম কি করিয়া এতটা সহ্য করিবে?

গঙ্গারাম ভাবিতে লাগিল,—ইহার কারণ কি? গঙ্গারাম ভাবিয়া চিন্তিয়া এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। মূর্খ গঙ্গারাম বিচার করিল,—যত গোলযোগের মূল তবে এই রোহিতাশ্বটা! এই রোহিতাশ্বটাই দেখিতেছি, শৈব্যার সকলখানি মন জুড়িয়া বসিয়া আছে—তাই এত গোলযোগ ঘটিতেছে—তাই সেখানে গঙ্গারাম বা অপর কাহারও স্থান নাই। সর্ব্বপ্রযত্নে তবে প্রথমতঃ এই রোহিতাশ্বটাকে নির্য্যাতিত করা চাই!

সুতরাং সেইদিন হইতে গঙ্গারাম একবারে উঠিয়া পড়িয়া রোহিতাশ্বের পিছনে লাগিয়া গেল। হায়, হতভাগ্য
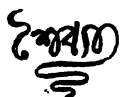
শিশুর সে দিন হইতে আর দুঃখের অবধি রহিল না। গঙ্গারাম রোহিতাশ্বকে দেখিলেই তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিল, পথে-ঘাটে একেলা পাইলেই বেশ দু'এক ঘা কীল-ঘুসি বসাইয়া দিতে লাগিল, আর সেইদিন হইতে গঙ্গারাম তাঁহাদের খোরাকীও অনেকটা কমাইয়া দিল।

একেই এক জনের অন্নে দু'জনাকে উদর পূর্ত্তি করিতে হইত, এখন এই সামান্য আহার্য্যে তাঁহাদিগের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। শৈব্যা রোহিতাশ্বকে পূর্ণোদর না করাইয়া নিজে কিছুই মুখে দিবেন না— রোহিতাশ্বও মাতাকে উপবাসী রাখিয়া নিজে কিছুই খাইবে না—মহা বিভ্রাট বাধিয়া গেল! মাতা অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজে পীড়ার ভাণ করিলেন।

রোহিতাশ্ব মাতাকে এখন খাইতে অনুরোধ করিলেই, শৈব্যা বলেন,—"বাবা, আমি কি আর খাইতে পারি?—আমার যে বড় অসুখ!—খাইলেই পীড়া বৃদ্ধি হইবে।" রোহিতাশ্ব প্রথমে সে কথা বুঝিতে পারিত না—অগত্যা খাইত; কিন্তু অবিলম্বেই

সে-ছল বুঝিতে পারিল। তখন একদিন রোহিতাশ্বও একটা ছল করিল।

রোহিতাশ্ব প্রভুর জন্য পুষ্প সংগ্রহ করিতে সর্ব্বদা বনে যাইত—একথা বলিয়াছি; একদিন বন হইতে প্রত্যাগত হইয়া বালক মাতার নিকট যাইয়া চুপি চুপি কহিল,—"মা, এই দেখ !"

মা চাহিয়া দেখিলেন,—ছেলের হাতে একটী বন্য ফল!

মা কহিলেন,—"ও কোথায় পাইলে ?"

রোহিতাশ্ব হাসিয়া কহিল,—"বনে ফুল তুলিতে গিয়াছিলাম, তথায় কুড়াইয়া পাইয়াছি—বড়ই মিষ্টি !—গাছে আরও অনেক আছে! আমার জন্য আর ভাবিও না মা, এখন আর আমার খাইবার ভাবনা নাই! মা, এখন হইতে তুমি অন্ন খাও, আমি ফল খাইব।"

শৈব্যার চক্ষে জল আসিল। শৈব্যা বলিলেন, "শুধু ফল খাইয়া কি থাকা যায় বাবা ? ফলও খাও, সঙ্গে সঙ্গে কিছু অন্নও গ্রহণ কর।"

কিন্তু রোহিতাশ্ব কিছুতেই সে কথা শুনিল না। রোহিতাশ্ব "অন্ন ভাল লাগে না" বলিয়া মাতাকে ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া পলাইল। মাতা কাঁদিতে লাগিলেন।

হায়, অযোধ্যার রাজকুমার শেষকালে কি ফল-মূলাহারী বন্য তপস্বী হইলেন?

কিন্তু ইহাই তো শেষ নহে, বিপদ্ একেলা আসে না, শৈব্যার আরও দুঃখ, আরও ভয়ানক কষ্ট অদৃষ্টে ছিল—অবশেষে একদিন সে কষ্টও আসিয়া উপস্থিত হইল। সে মর্ম্মঘাতী ঘটনার কথা বর্ণনা করিতে আমাদিগের লেখনী কম্পিত হইতেছে!

রোহিতাশ্ব ফলের কথা মাতার নিকট যাহা যাহা বলিয়াছিল, সকলই মিথ্যা বলিয়াছিল। সে ফল তো ভোজনযোগ্য নয়! সে কটু, বিস্বাদ, বন্য ফল ভোজন করিয়া প্রাণ ধারণ করা যায় না—রোহিতাশ্ব 'এটা বেশ জানিত ; জানিয়াও মাতাকে ভুলাইবার জন্য, মাতার কষ্ট দূর করিবার জন্য, ও কথা বলিয়াছিল।—কিন্তু এখন ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালায় তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিল!

প্রথম দিন রোহিতাশ্ব অনেক কষ্টে উপবাসী রহিল, কিন্তু দ্বিতীয় দিন তো আর থাকা যায় না। রোহিতাশ্ব

সে দিন বনে যাইয়া লতা-পাতা যাহা সম্মুখে পাইল, তাহাই খাইতে লাগিল। ক্ষুধার দায় বড় দায়!— রোহিতাশ্ব অবশেষে পুকুরে যাইয়া জল খাইয়া বাকী উদরাগ্নিটুকু দমন করিতে চাহিল। কিন্তু শুধু জলে তো সে আগুন নিবে না! তৃতীয় দিনে রোহিতাশ্ব একটী বৃক্ষতলে যাইয়া পেটে হস্ত দিয়া শুইয়া পড়িল!—যদি তাহাতেও একটু যাতনা কমে! কিন্তু তাহাতেও যাতনা কমিল না! অবশেষে রোহিতাশ্ব "কোথায় হরি! কোথায় দীনবন্ধু হে" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রোহিতাশ্ব শুনিয়াছিল, তেমন বিপদে পড়িয়া হরিকে ডাকিলে হরি অবশ্যই লোকের যন্ত্রণা দূর করিয়া থাকেন।' ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতির উপাখ্যানে রোহিতাশ্ব মাতার মুখে এমন অনেক কথা শুনিয়াছিল। সরল শিশু এখন সেই বিশ্বাসে অন্তরের সহিত, অতি গাঢ় ভাবে হরিকে প্রাণপণে ডাকিতে লাগিল। রোহিতাশ্ব ডাকিল,— "হরি! কোথায় হরি, কোথায় তুমি প্রভু, দেখা দাও, আমার এ কষ্ট দূর কর, মাতার কষ্ট দূর কর।

প্রহ্লাদের হরি, ধ্রুবের হরি, আজ রোহিতাশ্বও যে তোমার শরণাপন্ন, তেমনি বিপদ্‌গ্রস্ত—তাহাকে কি তুমি রক্ষা করিবে না ? এস, একবার এস !"

রোহিতাশ্ব এইরূপ আকুল ভাবে কাতর অন্তরে হরিকে বার বার ডাকিতে লাগিল, ডাকিতে ডাকিতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা যেন তাহার অনেকটা কমিয়া গেল। রোহিতাশ্ব ভাবিল, "আহা ! নামোচ্চারণেরই এই গুণ, হরির কৃপা হইলে না জানি আরও কত কি আনন্দ হইবে !—রোহিতাশ্ব আরও প্রাণপণে হরিকে ডাকিতে লাগিল। হঠাৎ বালকের মাথায় উপর হইতে কি একটা পতিত হইল !

রোহিতাশ্ব চমকিয়া উঠিল। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, বৃক্ষের উপর হইতে তাহার উপর একটা ফল পতিত হইয়াছে। রোহিতাশ্ব তাড়াতাড়ি কুড়াইয়া লইয়া সে ফলটী আস্বাদ করিল—আহা !—কি মিষ্টি ! রোহিতাশ্ব চাহিয়া দেখিল, বৃক্ষে আরও তদ্রূপ ফল অসংখ্য ঝুলিতেছে, তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। কৈ, এতদিন সে বনে বনে ঘুরিতেছে,

এক দিনও তো এ ফলের সন্ধান পায় নাই! রোহিতাশ্ব স্থির করিল, এ নিশ্চয়ই হরির দয়া! হরিই আজ তাহার উপর কৃপা করিয়া তাহার জন্য স্বহস্তে এই অসংখ্য ফল বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন! হরির প্রতি রোহিতাশ্বের ভক্তি এবার আরও শতগুণে বাড়িয়া গেল। রোহিতাশ্ব হস্তস্থিত ফুলের সাজিটী মাটিতে রাখিয়া বৃক্ষোপরি আরোহণ করিতে লাগিল।

কিন্তু আরোহণ করিতেই অর্দ্ধপথে—একি উৎপাত! রোহিতাশ্ব দেখিল, একটু উপরেই তাহার পথরোধ করিয়া এক ভীষণ কাল সাপ ফোঁস্ ফোঁস্ রবে গর্জ্জন করিতেছে! রোহিতাশ্ব সর্পকে দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইল। মনে মনে কহিল,—এ বড় অন্যায়! হরি আমার জন্য এত সব ফল স্বহস্তে ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন, আর সর্পের তো বড় আস্পর্দ্ধা, সে আমাকে উহা স্পর্শ করিতে দিবে না। রোহিতাশ্ব স্থির করিল, "তাহা হইবে না, সর্পের ভয়ে কখনও হরির দান ফেলিয়া পলাইব না। যাহা থাকে অদৃষ্টে, অগ্রসর হইব।"

একে ক্ষত্রিয়ের সন্তান, তাহাতে আবার ক্ষুধা-তৃষ্ণায় উদর জ্বলিতেছিল, রোহিতাশ্ব এইবার দর্প করিয়া সর্পের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল ; সর্পও ফণা বিস্তৃত করিয়া ক্রুদ্ধভাব প্রদর্শন করিল। রোহিতাশ্ব কহিল,—"সর্প, সরিয়া দাঁড়াও, আমি হরির আজ্ঞায় ফল সংগ্রহ করিতে যাইতেছি, আমার পথ-রোধ করিও না।"

সর্প "ফোঁস্" করিয়া শুধু ক্ষুদ্র উত্তর করিল। রোহিতাশ্বের এবার আরও রাগ হইল।

বালক রাগিয়া কহিল, "আমার কথা তবে শুনিবে না ? দেখ, আমার মাতা পীড়িতা,আমি তিন দিন উপবাসী —এই ফলগুলির উপর আমাদের জীবিকা নির্ভর করিতেছে,তুমি কেন ইহাতে বাদ সাধিবে ?—পথ ছাড়।"

সর্প আবার সেই ফোঁস রব করিল, এবার রোহিতাশ্বের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল ! একে ক্ষত্রিয় বালক, তাহাতে আবার এত অধিক পীড়িত, রোহিতাশ্ব সর্পকে ঠেলিয়া উপরে উঠিতে গেল,—সর্প তৃতীয়বার ফোঁস রবে তাহাকে দংশন করিল !

তখন রোহিতাশ্ব বিষ-জর্জ্জরিত দেহে সবেগে ভূতলে পতিত হইল।

হায়, অভাগিনী শৈব্যা! এ সময় তুমি কোথা? তোমার নয়নের মণি, হৃদয়ের ধন, দুঃখের একমাত্র অবলম্বন পুত্র কালসর্পের নিষ্ঠুর দংশনে আজ জন্মের শোধ তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে! এ সংবাদ পাইলে তোমার না জানি কি দুর্দ্দশাই হইবে!

বন ব্রাহ্মণের আলয় হইতে অতি নিকট—এ সংবাদ পাইতে শৈব্যার অধিক বিলম্ব হইল না।

এ সংবাদ পাইয়া শৈব্যার কি অবস্থা হইল, তাহা পাঠক-পাঠিকা অনুমান করুন—আমরা সে কথা বর্ণনা করিতে অশক্ত।

পুত্রহারা রমণীর হৃদয়ের দুঃখ কে কবে ঠিক্ ঠিক্ বর্ণনা করিতে পারিয়াছে? সে অতলস্পর্শ সাগরের ন্যায় অতল, অপরিমেয়; তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া বাতুলতা মাত্র!

শ্মশানে চণ্ডালবেশী হরিশ্চন্দ্র।

শ্মশানে শৈব্যা।

শ্মশানে শৈব্যা।

(২)
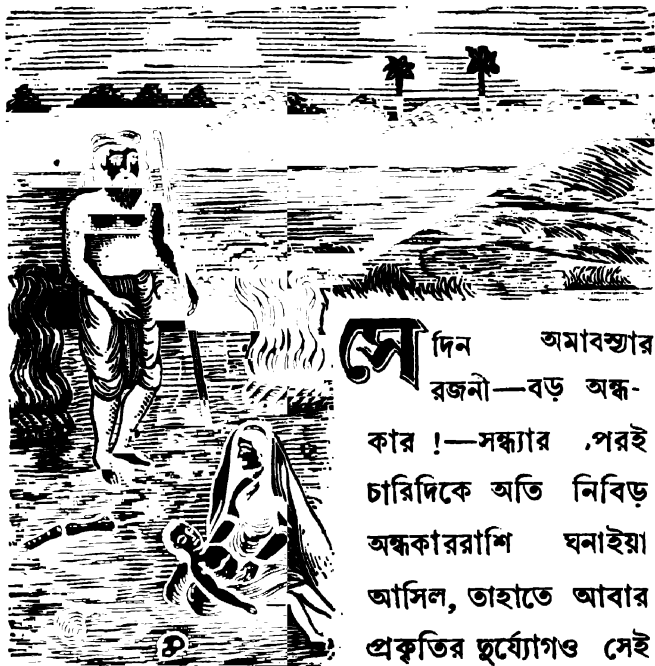
সেদিন অমাবস্যার রজনী—বড় অন্ধকার!—সন্ধ্যার পরই চারিদিকে অতি নিবিড় অন্ধকাররাশি ঘনাইয়া আসিল, তাহাতে আবার প্রকৃতির দুর্য্যোগও সেই সঙ্গে যোগ দিল, চারিদিকে অতি ভীষণ দৃশ্যই প্রকটিত হইল!

কাশীর মহাশ্মশানের দৃশ্য সেই সময়ে বড় ভয়ানক! সে ভয়ানক দৃশ্য বর্ণনা করা বড় সহজ কথা নহে। নগরীর অদূরে এক জনমানবহীন বিস্তৃত প্রান্তর!—সেই প্রান্তরের মধ্যে ভীষণ শ্মশান-ভূমি—সেই শ্মশান-ক্ষেত্রে কত চিতা, কত শব, কত শবাস্থি পড়িয়া রহিয়াছে; কত দগ্ধ, অর্দ্ধদগ্ধ, অদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড ইতস্ততঃ গড়াগাড় যাইতেছে; কত শৃগাল-কুক্কুর, শকুনি-গৃধিনী চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে—কে তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিতে পারে?

একে এইরূপ ভীষণ শ্মশান, তাহাতে আবার আকাশজোড়া বড় বড় মেঘখণ্ডগুলি চারিদিক্ ঢাকিয়া আসিয়াছে, ইতস্ততঃ ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতেছে, ঘন ঘন বজ্রধ্বনি হইতেছে, সে দিন বুঝি প্রলয় উপস্থিত!

এই ভীষণ শ্মশানে, প্রকৃতির এই ভয়ানক দুর্য্যোগ ও বিভীষিকার মধ্যেও দীর্ঘ দীর্ঘ যষ্টি হস্তে কয়েকটী চণ্ডাল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে—শ্মশানাধিপতি প্রধান চণ্ডালের আজ্ঞায় তাহারা ইতস্ততঃ

পাহারা দিতেছে, মৃতদেহের সৎকার করিতেছে, মৃতের উপর কর আদায় করিতেছে—এসব ইহাদের নিত্যকার্য্য ! শত-শত চিতাগ্নির ক্ষীণ আলোকে তাহাদের ভীষণমূর্ত্তি-গুলি আজ কি অপূর্ব্ব-রহস্যময় ও ভীষণই দেখাইতেছে !

শুধু একজন চণ্ডাল সেই সব হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়া আছে।

সেই চিতাগ্নি সকলের অদূরে একটী বৃক্ষোপরি দেহ-ভার ন্যস্ত করিয়া চণ্ডাল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছে !

এ চণ্ডাল কে ?

তাহার আকৃতি বিশাল, বাহুযুগল দীর্ঘ, ললাট উন্নত !—চণ্ডাল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখস্থ চিতাগ্নির প্রতি দৃষ্টি করিয়া আছে—ভাবনা-স্রোতে তাহার বাহ্য জ্ঞানও বুঝি লুপ্ত হইয়াছে ! চণ্ডালের এক হস্ত শূন্যে চিতাগ্নির দিকে প্রসারিত !

হঠাৎ কাহার করুণ রোদনধ্বনি তাহার এ স্তম্ভিত ভাবটাকে বিদূরিত করিয়া দিল ! সেই ভীষণ মেঘগর্জ্জন ও শৃগাল-গৃধিনীর আনন্দধ্বনির ভিতরেও
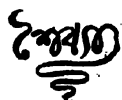
অকস্মাৎ কাহার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া তাহার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল! চণ্ডাল তাড়াতাড়ি একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া সেই দিক্‌ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

মানুষ, তুমি যদি ধনের অহঙ্কার কর, সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার কর, ক্ষমতার অহঙ্কার কর, তবে আজ একবার এই দুর্য্যোগে এই মহাশ্মশানে ছুটিয়া আইস—আসিয়া ঐ যে ওই ভীষণ স্থানে এক অনাথিনী রমণী মৃতপুত্র কোলে আকুলস্বরে রোদন করিতেছে, সেই খানে যাইয়া দাঁড়াও—সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইবে!

এই রমণী একদিন রাজরাণী ছিল, এই শিশু একদিন রাজপুত্র ছিল! একদিন ইঁহাদের সন্তোষ বিধানের জন্য শত-সহস্র কিঙ্কর-কিঙ্করী নিযুক্ত থাকিত; রাজপ্রাসাদের প্রমোদ-উদ্যানে অসংখ্য স্বর্ণপ্রদীপ একদিন সেইজন্যে উজ্জ্বল প্রভায় চারিদিক্‌ আলোকিত করিয়া জ্বলিত; কিন্তু তবু তাহাতে তাঁহাদের তৃপ্তি হইত না! আজ ইঁহারা এই মহাশ্মশানে!

আজ এই দুর্য্যোগে, এই অন্ধকারে ও ভীষণ

অবস্থায় ইঁহাদের মুখপ্রতি চাহিবার কেহ নাই! আজ রোহিতাশ্বের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করে, শৈব্যার নিকটে এমন অর্থ নাই! আজ শৈব্যাকে এই দুর্য্যোগে পথ দেখাইয়া এই শ্মশানে লইয়া আসে, এমন সহায়ও একজন ছিল না! অভাগিনী শৈব্যা অতিকষ্টে আপনি পথ খুঁজিয়া, আপনি মৃতপুত্রকে কোলে করিয়া, আপনার উপর আপনি নির্ভর করিয়া, কত অচেনা, অজানা পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া তবে এই শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! কিন্তু আর তো অভাগিনী পারে না—শৈব্যার দেহে আর বল নাই, শৈব্যা এইবার বসিয়া পড়িয়াছে!

হায়, শৈব্যা এখন কি করিবে? শৈব্যা তো অনেক চেষ্টায়, অনেক পরিশ্রমে পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া এই পর্য্যন্ত আসিয়াছে, কিন্তু এইবার কি করিতে হয়, শৈব্যা তাহা জানে না। হতভাগিনীর জীবনে এরূপ অবস্থা আর ঘটে নাই, এরূপ ভীষণ অবস্থার কল্পনাও বুঝি আর কখনও তাহার মনকে পীড়িত করে নাই;—শৈব্যা এ অন্তিমকালে পুত্রের শেষ কার্য্যটুকু কি

করিয়া সম্পন্ন করিবে? শৈব্যা আকুল হইয়া পাগলিনীর মত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে আকুল ক্রন্দন শুনিয়া শ্মশানের শৃগাল-কুকুরগুলিও দূরে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল!

শৈব্যা কাঁদিতেছিলেন,—এইরূপ আকুল ভাবে, কাতর অন্তরে কাঁদিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ একবার বিদ্যুৎ চমকিল! সঙ্গে সঙ্গে গুরুগম্ভীরস্বরে মেঘও ডাকিয়া উঠিল। সেই বিদ্যুতের উজ্জ্বলালোকে শৈব্যা হঠাৎ চাহিয়া দেখিলেন,—অদূরে তাঁহার সম্মুখে সেই ভীষণ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া একজন কে! শৈব্যা হঠাৎ শিহরিয়া উঠিলেন!

চারিদিকের ভীষণতার মধ্যে ভীষণতম পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিয়া, শৈব্যা দেখিলেন, কে এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ দণ্ডহস্তে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে! ভাবিলেন,—এ বুঝি যম। প্রাণপণে রোহিতাশ্বকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—“কে তুমি?—যম! আমার পুত্রকে লইতে

আসিয়াছ ? তোমার পায়ে ধরি, আমার বাছাকে লইও না, আমায় লও ; বাছাকে লইলে আমি বাঁচিব না, আর একজন আছেন—তিনিও বাঁচিবেন না। হে যম, আমার মিনতি রাখ, আমায় লও—আমার বাছাকে রাখিয়া যাও।”

শৈব্যা এইরূপ অসংখ্য কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন, তাঁহার পার্শ্বস্থ মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কতক্ষণ সেই কাতরোক্তিগুলি শ্রবণ করিল। তাহারও হৃদয় বুঝি এ করুণ ক্রন্দনে বিগলিত হইয়া গেল। হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেই মূর্ত্তি কহিল,—“হতভাগিনি! আমি যম নই—মানুষ, তোমারই মত মানুষ—তোমারই মত হতভাগ্য! বৃথা কেন শোক করিতেছ? সংসারের এই রীতি! মানুষের এই পরিণাম!—একদিন হঠাৎ আসে, আবার একদিন হঠাৎ চলিয়া যায়,—কাঁদিয়া-কাটিয়া কেউ তাতে কখনো বাধা দিতে পারে না। প্রতি দিন, প্রতি সন্ধ্যায় এই শ্মশানে দাঁড়াইয়া আমি ইহারই সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছি। দেখিতে দেখিতে

আমার হৃদয় কঠিন হইয়া গিয়াছে, আমার হৃদয়ের কঠোর সন্তাপও বুঝি দূর হইয়া গিয়াছে! রমণি, আর কেন?—উঠ, এস, বুক বাঁধিয়া পুত্রের শেষ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হও। ঐ উপরে মেঘগর্জ্জন হইতেছে, শুনিতেছ? এখনি ঝড় উঠিবে!—বড় বিপদে পড়িবে! এস, আর বিলম্ব করিও না, এস।"

অপরিচিতের এই কাতর স্বরে শৈব্যা বিস্মিত হইলেন। এ ব্যক্তি কে? যে হউক, তাহারও একটা অন্তর আছে, এমত অনুভূত হইল। অন্তর না থাকিলে তেমন মধুর স্বরে, তেমন করুণ কণ্ঠে, কেউ কথা কয় না; অন্তর না থাকিলে তেমন কঠিন শরীর হইতে তেমন দীর্ঘনিশ্বাস কখনও বাহির হয় না; অন্তর না থাকিলে তেমন নিস্তব্ধ দৃষ্টিতে তেমন অভাগিনীর প্রতি কেউ চাহিয়া থাকে না! শৈব্যা কাতর দৃষ্টিতে আবার তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, কিন্তু ঘোর অন্ধকার এইবার তাঁহার দৃষ্টিপথ বন্ধ করিয়া দিল।

শৈব্যা কহিলেন,—"অপরিচিত, কে তুমি? স্বরে

বুঝিতেছি, তুমি তত ভীষণ নও—তোমার আকৃতি দেখিয়া তোমায় যত ভীষণ মনে করিতেছি। তুমি কি আমারই মত কোনও হতভাগ্য ? না কোন দেবতা, ছল করিয়া আমার দুঃখ দূর করিতে এই ছদ্মবেশে আসিয়াছ ? দেবতা, দেবতা,—আর কেন ? এইবার ছল পরিত্যাগ কর ; তুমি তো সব জান, তবে কেন আর বৃথা মনস্তাপ দিতেছ ?—আমার পুত্রকে ফিরাইয়া দাও। হে দেবতা, যদি কৃপা করিয়া আসিয়াছ, দুঃখিনীর প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিও না, আজ আমার সর্ব্বস্ব যাইতেছে, আমায় রক্ষা কর, আমার পুত্রকে ফিরাইয়া দাও, তোমার পায়ে পড়ি, আমার পুত্রকে ফিরাইয়া দাও।"

শৈব্যা এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ আকুল স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চণ্ডাল ইহা দেখিয়া আবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

চণ্ডাল কহিল,—"ভদ্রে, কেন অবিশ্বাস করিতেছ ? আমি সত্যই কহিতেছি,—আমি দেবতা নই,—মানুষ, চণ্ডাল—মনুষ্যাধম মাত্র! এই শ্মশানে দিবারাত্রি

মৃত দাহ করা, মৃত দাহ করিয়া তাহার মূল্য সংগ্রহ করা আমার কর্ত্তব্য।—কেন বৃথা ভুল বুঝিতেছ? এস, তুমি মৃত দাহ করিতে আসিয়াছ, এখনই আমার পরিচয় গ্রহণ কর। তোমার ছেলের সৎকারের জন্য পাঁচ কাহণ কড়ি চাই!—সেই অর্থ আমায় প্রদান কর! আমি সৎকারের সকল বন্দোবস্ত করিয়া তোমার সাহায্য করিতেছি, আর তোমার কিছুই ভাবিতে হইবে না,—কৈ, দাও।"

চণ্ডাল এই কথা কহিলে, শৈব্যা আরও কাঁদিতে লাগিলেন। শৈব্যার নিকট তো এক কপর্দ্দকও নাই, শৈব্যা কোথা হইতে এখন সে পাঁচ কাহণ কড়ি দিবেন? শৈব্যা চারিদিক্ অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। হায়, অযোধ্যার রাজকুমার রোহিতাশ্বের পাঁচ কাহণ কড়ির অভাবে আজ সৎকার হইতেছে না! শৈব্যা এ দুঃখ রাখিবারও স্থান খুঁজিয়া পাইলেন না! কে আজ শৈব্যাকে এ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবে? কে আজ তাঁহাকে দয়া করিয়া এখন পাঁচ কাহণ কড়ি ভিক্ষা দিবে?

শৈব্যা কেবলই কাঁদিতে লাগিলেন। হায়, পাঁচ কোটী সুবর্ণ মুদ্রা একদিন যাঁহার মুখের কথায় ব্যয়িত হইতে পারিত, পাঁচটী কাণা কড়ির জন্য সে রাজরাণী আজ ভূলুণ্ঠিত হইয়া আকুল স্বরে ক্রন্দন করিতেছেন, কিন্তু তবু তার সংস্থান হইয়া উঠিতেছে না,—কি অপূর্ব্ব রহস্য!

শৈব্যাকে তদ্রূপ ক্রন্দন করিতে দেখিয়া চণ্ডাল আবার কহিল,—"দেবি, এ সংসারে কি তোমার এমন কেহ নাই যে, এ বিপদের সময়ও তোমায় দু'টী পয়সা দিয়া সাহায্য করে? তুমি কি প্রকৃতই অনাথিনী? ভাবে বুঝিতেছি—তুমি সধবা; তোমার পতি কি তবে এতই নিষ্ঠুর!"

চণ্ডাল এই কথা কহিলে, শৈব্যার মনে হইল, কে যেন একখানি বিষাক্ত ছুরিকা আমূল তাহার বক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিল! হা ভগবান্, পতি নিষ্ঠুর! শৈব্যার পতি নিষ্ঠুর! শৈব্যাকে অবশেষে এ কথাও শুনিতে হইল! অযোধ্যার প্রজাবৎসল মহারাজ, দয়ার সাগর, শৈব্যার

চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হরিশ্চন্দ্র—নিষ্ঠুর! চণ্ডাল আজ না জানিয়া-শুনিয়া এ কি কহিতেছে! শৈব্যা কি করিয়া আজ এ কথা সহ্য করিবেন? শৈব্যা আজ আর কিছুতেই ধৈর্য্যের বাঁধন রাখিতে পারিলেন না—গদ্‌-গদ-কণ্ঠে চণ্ডালকে কহিলেন,—"শ্মশানরক্ষক, না জানিয়া শুনিয়া কাহার নিন্দা করিতেছ? যিনি আজন্ম প্রজার সুখ-দুঃখ ভাবিয়া নিজ সুখশান্তি বিস্মৃত হইয়াছেন, যিনি এ হতভাগিনীকে ভিন্ন আর কাহাকেও কখনও জানিতেন না, এই চিরনিদ্রিত বালক একদিন যাঁহার নয়নের মণি, হৃদয়ের সর্ব্বস্ব, কণ্ঠের হার ছিল, তাঁহাকে তুমি নিষ্ঠুর বলিতেছ? চণ্ডাল, এ তুমি কি বলিলে? কেন বৃথা এ সময় পতি-নিন্দা করিয়া আমার মনে দ্বিগুণ দারুণ ব্যথা জাগাইয়া দিলে! চণ্ডাল, তুমি তো জাননা, কত বিপদে পড়িয়া তিনি এ হতাভগিনীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন! কত অনিচ্ছাসত্ত্বে তিনি আমাদিগকে অন্যের হাতে সঁপিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন!—উঃ! সে কথা মনে হইলেও

যে প্রাণ ফাটিয়া যায় !—চণ্ডাল, চণ্ডাল, শ্মশানের বন্ধু, কেন তুমি আজ সে কথা ভুলিলে !"

এ কি !—এ কি !—এ অনাথিনী কে ? প্রজার মুখ চাহিয়া সর্ব্বস্ব বিস্মৃত হইতেন—ইঁহার স্বামী ! বিপদে পড়িয়া ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন—ইঁহার স্বামী ! অন্যের হাতে পত্নীকে সঁপিয়া দিয়াছেন—ইঁহার স্বামী !—চণ্ডাল, চণ্ডাল, এ অনাথিনী কে ? এ জগতে স্ত্রী-পুত্রত্যাগী ভিখারী রাজ-রাজেশ্বর আরও দ্বিতীয় কেহ আছে নাকি ? চণ্ডাল চমকিত হইল, কম্পিত হইল, উদ্‌ভ্রান্ত হইল—তাহার সর্ব্বশরীর অসাড় হইয়া আসিল। চণ্ডাল দুই লম্ফে শৈব্যার নিকটে যাইয়া একবার এক অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখ প্রতি চাহিল ; কিন্তু দারুণ অন্ধকার দৃষ্টির পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল—কিছুই দেখিতে পাইল না। চণ্ডাল তখন বিকট কণ্ঠে চীৎকার করিয়া রুদ্ধশ্বাসে কহিল,—"কে তুমি ! কে তুমি ! কে তুমি ! বল, শীঘ্র বল,—কে তুমি ? তোমার স্বামী রাজা, তোমার স্বামী

স্ত্রী-পুত্রত্যাগী ; দেবি, বল বল তুমি কে ? তুমি তো দুর্ভাগ্য হরিশ্চন্দ্রের মহিষী শৈব্যা নও ?—তুমি তো অযোধ্যার রাজমহিষী অদৃষ্টগুণে ব্রাহ্মণের নিকট পঞ্চ-শত মুদ্রায় বিক্রীত নও ?। বল বল, তোমার একটী বাক্যের উপর এ চণ্ডালের আজ ইহজীবনের সর্ব্বস্ব নির্ভর করিতেছে—বল, ঐ হতভাগ্য শিশু তো তাহারই সন্তান রোহিতাশ্ব নয় ?”

শৈব্যা বসিয়াছিলেন, চণ্ডালের এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। এক পলকে বিদ্যুতের মত আসিয়া তিনি তাহার সম্মুখে মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়া, কি এক ভয়ানক দৃষ্টিতে তাহার মুখ প্রতি তীব্র ভাবে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর যেন কি একটা তাড়িত খেলিয়া গেল। শৈব্যা শব্দ করিতে পারিলেন না, কথা কহিতেও পারিলেন না,—হঠাৎ কি এক স্তব্ধভাবে শুধু দাঁড়াইয়া রহিলেন !—এক মুহূর্ত্ত এই ভাবে থাকিলেন।

সহসা আকাশে বিদ্যুৎ চমকিল। শৈব্যার আর কথা কহিবার প্রয়োজন হইল না। সেই বিদ্যুৎসাহায্যে

উভয়েই উভয়কে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। মৃত রোহিতাশ্বের মুখমণ্ডল চণ্ডালের নয়নগোচর হইল; শৈব্যার ক্ষীণ কাতর মুখমণ্ডলটীও চণ্ডালের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মুখে ধরা পড়িল; চণ্ডাল শিহরিয়া উঠিল! তখন চণ্ডাল—সেই মৃতদাহকারী শ্মশানরক্ষকের ভৃত্য চণ্ডাল, "শৈব্যা, শৈব্যা, প্রাণের রোহিত আমার, এই তোমাদের পরিণাম!"—এই কথা বলিতে বলিতে উন্মত্তবৎ হঠাৎ যাইয়া শৈব্যাকে জড়াইয়া ধরিল!

আর শৈব্যা?

হায়, তখন শৈব্যার কথা কে আর বর্ণনা করিতে পারে?

শৈব্যার কথা তখন বর্ণনাতীত! এক মুহূর্ত্তে অভাগিনীর চারিদিকে যেন কি একটা যুগ-প্রলয় হইয়া গেল! শেব্যা হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলেন না, হঠাৎ কিছু ধারণা করিতে পারিলেন না, তাঁহার নয়নদ্বয় জ্যোতি-হীন হইয়া আসিতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, হাত পা অবশ হইয়া গেল, মুহূর্ত্ত মধ্যে অভাগিনী স্বামীর হৃদয়ে ঢলিয়া পড়িলেন!—শৈব্যা চেতনা হারাইলেন!

(২)

সেইরূপ অবস্থায় উভয়ের আলিঙ্গনে উভয়ে আবদ্ধ হইয়া তাঁহারা অনেকক্ষণ কাটাইলেন। আকাশে বিদ্যুৎ চমকিতেছিল, "গুড়ুম্ গুড়ুম্" শব্দে মেঘ-গর্জ্জন হইতেছিল, 'সন্ সন্' করিয়া বাতাস বহিয়া যাইতেছিল, সেই বাতাসে অদূরে ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে শত শত চিতা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল,—ক্রোড়ে মৃত পুত্র, কিন্তু তবু কাহারও চৈতন্য নাই—কেহ সে বিভীষিকা অনুভব করিতে পারিলেন না! শৈব্যা অচৈতন্য, চণ্ডালবেশী হরিশ্চন্দ্র নিজ অদৃষ্টচিন্তায় বিভোর—বাহিরের বিভীষিকা কে দেখিবে?

সেই যে দিন কাশীর বিপণিতে নিষ্ঠুর ঋষির ইচ্ছায় হরিশ্চন্দ্র স্ত্রী-পুত্র বিক্রয় করিয়াছিলেন, সেই যে দিন প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে হরিশ্চন্দ্র

পত্নীর কাতর প্রার্থনায় দরিদ্র ব্রাহ্মণের অন্ন-ভিখারী করিয়াছিলেন, সেই যে দিন শত চেষ্টা—শত কাতর প্রার্থনা সত্ত্বেও তিনি পত্নী-পুত্রকে ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই, সেই দিন—সেই দিন হইতেই তাঁহার সব গিয়াছিল,—সেই দিন হইতেই সুখশান্তি বলিয়া যাহা কিছু ছিল, হরিশ্চন্দ্র একবারে তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, নিজকেও অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত চণ্ডালের নিকট বিক্রীত করিয়াছিলেন—কিন্তু তবু তখনও একটা জিনিষ তাঁহার ছিল,—হরিশ্চন্দ্রের হৃদয়ে আশা ছিল! সেই আশার ক্ষীণ জ্যোতিতে চণ্ডালের গৃহে, পরের দাসত্বে, ভীষণ শ্মশানের মধ্যেও তিনি জীবনের আকর্ষণ একবারে হারাইয়া ফেলেন নাই। কিন্তু আজ আর সে আশার আলোকও নাই—নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে! আজ আর কে তাঁহাকে এ সংসারে ধরিয়া রাখিবে?

হরিশ্চন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন,—হায়! তবে আর এখন বাঁচিয়া সুখ কি? পুত্র মৃত, পত্নী পুত্রশোকে

উন্মাদিনী, নিজে মনুষ্যের অধম—চণ্ডালের ভৃত্য!—কুহকিনী আশা তো অতি চমৎকার স্থানে লইয়া আসিয়াছে!—আর উহাকে প্রশ্রয় দিয়া কি হইবে?

হরিশ্চন্দ্র একবার শৈব্যার দিকে ও একবার রোহিতাশ্বের দিকে চাহিলেন। প্রবল বায়ু সে সময় আকাশের ঘন-ঘটা এক দিকে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল, চারিদিক্ পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছিল, উষার আলোক মৃদু-মৃদু আসিয়া তাঁহাদের মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িতেছিল—হরিশ্চন্দ্র প্রাণ ভরিয়া সে মুখ দু'খানি দেখিতে লাগিলেন। গণ্ড বহিয়া তাঁহার অজস্র অশ্রু-স্রোত বহিল।

হায়, তাঁহার তো সকলই ছিল। এমন পুত্র! এমন পত্নী! এমন রাজভক্ত প্রজা! শস্যশ্যামল বিটপিরাজী-পূর্ণ এমন অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ রাজ্য!—সব কোথায় উড়িয়া গেল! সে সব তো এখন একবারেই স্বপ্ন! হায়, আবার যদি বারেকের জন্যও তা ফিবিয়া আসিত!

হরিশ্চন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন,—"হায় আর সে

সব বারেকের জন্যও কিছুতেই ফিরিয়া আসে নাকি ? হরিশ্চন্দ্র কত ভাবিলেন, কত চিন্তা করিলেন, কিন্তু সব কথার শেষে সেই কথাটুকুই বার বার মনে আসিতে লাগিল,—"হায়, আর একবার তা ফিরিয়া আসে নাকি ?"

হরিশ্চন্দ্র হঠাৎ চমকিত হইলেন! কে যেন তাঁহার পার্শ্ব হইতে অতি স্নেহময় কণ্ঠে সে কথার উত্তরে কহিল—"আসে, হরিশ্চন্দ্র, আসে! তোমার ন্যায় সাধু, ধর্ম্ম-পরায়ণ নরপতির জীবনে আসিবে না ত কি ? রাজন্, কেন দুঃখ করিতেছ ? ঐ চাহিয়া দেখ, ঐ রজনীর ঘনঘটার সহিত তোমার দুঃখের নিশী চিরতরে অবসান হইতেছে! উঠ—আর কোন চিন্তা নাই, উঠিয়া আশী-র্ব্বাদ গ্রহণ কর।"

হরিশ্চন্দ্র উঠিলেন না, কিন্তু চাহিয়া দেখিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহা তো বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। একবার চক্ষু মর্দ্দিত করিলেন,—সত্যই কি তাই! হরিশ্চন্দ্র আবার চক্ষু মর্দ্দিত করিলেন,—আবার সেই! হরিশ্চন্দ্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন!

হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন, রজনী প্রভাত হইয়াছে, চারিদিক্ উষার নির্ম্মলালোকে পূর্ণ হইয়াছে, গাছে গাছে সুমধুর স্বরে পাখী গাহিতেছে, আর সে সকলের মধ্যে তাঁহার সম্মুখে—অতি সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক অতি শান্ত, সৌম্য মূর্ত্তি তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন—সে বিশ্বামিত্র ঋষি।

হরিশ্চন্দ্রের মাথা ঘুরিয়া গেল! উষার স্নিগ্ধ বায়ুতে অল্পে অল্পে শৈব্যারও চেতনা ফিরিয়া আসিতেছিল, শৈব্যাও হঠাৎ এই দৃশ্য দেখিয়া বিহ্বল্ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে আর কেহ বাক্যব্যয় করিলেন না—কেহ বাক্যব্যয় করিতে পারিলেন না। তাঁহারা কেবলই বদ্ধদৃষ্টিতে মুগ্ধনয়নে মহর্ষির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মহর্ষি আবার কহিলেন,—"বৎস, রাজন্, উঠ; আমি মোহিত হইয়াছি! কর্ম্মবীর, ক্রোধান্ধ হইয়া আমি তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু এ যুদ্ধে আমার সম্পূর্ণ পরাজয়! আজ তুমি আমায় অনেক

শিক্ষা দিলে! হরিশ্চন্দ্র, জগতে ঠেকিয়া শিখার মত শিক্ষা আর নাই; তাই আমি যখনই যাহা শিক্ষা করিয়াছি, বিপরীত দিক্ দিয়া আরম্ভ করিয়া শিখিয়াছি—কখনও সরল পথে যাই নাই। বশিষ্ঠের সঙ্গে এই জন্যেই আমার শত্রুতা হইয়াছিল,—এই জন্যই ক্ষত্রিয় হইয়াও আমি তাঁহার সাহত প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে নামিয়াছিলাম; দেবতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া এইজন্যেই আমি ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে পাঠাইতে চাইয়াছিলাম; তোমার সঙ্গেও হরিশ্চন্দ্র, এই জন্যেই শত্রুতা করিয়াছিলাম; কিন্তু রাজন্, তোমার নিকট আমার সম্পূর্ণ পরাজয় হইয়াছে!—বিশ্বামিত্র-ঋষিকে তুমি এবার সর্ব্বাপেক্ষা বড় শিক্ষা দিয়াছ! রাজন্, আজ হইতে বিশ্বামিত্র শিখিল,—ধর্ম্ম যাহাকে রক্ষা করে, তাহার ধ্বংস কিছুতেই নাই ;—ইহলোকেও নাই, পরলোকেও নাই, দেবতার কাছেও নাই, তপস্বীর কাছেও নাই। হরিশ্চন্দ্র, পুত্র হারা হইয়া আত্মবিস্মৃত হইতেছিলে? কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি,

আমাদের এ যুদ্ধে কে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত! তুমি রাজ্য হারাইয়াছ বটে, কিন্তু তোমার কীর্ত্তিতে সংসার ভরিয়া গিয়াছে! আর আমি? আমি রাজ্য পাইয়াছি বটে, কিন্তু এই রাজ্যপ্রাপ্তিই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই রাজ্যপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আমার তপ, জপ, সন্ধ্যা, আহ্নিক সব মাটি হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র, আমি অনেক কষ্টে ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলাম, কিন্তু এই রাজ্যসম্পদ্ আজ আবার আমার সেই ব্রহ্মত্ব কাড়িয়া লইতে উদ্যত! রাজন্, আজ তুমি আসিয়া আবার তোমার সিংহাসন অধিকার কর, আমায় এ বিভীষিকা হইতে মুক্তি দাও।”

হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা এইবার উভয়েই উঠিয়া বিশ্বামিত্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিলেন; তার পর গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন,—“প্রভু, আপনি অতি মহৎ, তাই এই বিপদে এমন ভাবে আজ আমাদিগকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছেন। কিন্তু প্রভু, আর তো আমাদিগের এ সান্ত্বনার প্রয়োজন নাই—এ রাজসম্পদের উপর

আর তো আমাদের কোন প্রলোভন নাই! যার জন্য এই সিংহাসন, এই রাজ্য, সে তো ওই ধরামাঝে চিরনিদ্রায় চির অভিভূত! প্রভু, এইবার আমাদিগকে অন্য আশীর্ব্বাদ দিন;—যাহাতে এ সংসার হইতে এই মূহূর্ত্তে বিদায় গ্রহণ করিতে পারি, সেই ব্যবস্থা করুন।

বিশ্বামিত্র কহিলেন,—"বৎস, ব্যথিত হইও না! আমিই তোমার পুত্রহত্যার কারণ হইয়াছি, আমিই আবার তোমার পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত করিব। এই পূত-বারি-স্পর্শে রোহিতাশ্ব পুনর্জ্জীবিত হউক্।"

এই বলিয়া বিশ্বামিত্র নিজ কমণ্ডলু হইতে মৃত-সঞ্জীবন বারি বাহির করিয়া রোহিতাশ্বের শব-দেহের উপর সেচন করিলেন। সে জল স্পর্শে রোহিতাশ্ব তৎক্ষণাৎ চৈতন্য পাইয়া চক্ষু মেলিয়া বসিল!

হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা তখন রোহিতাশ্বকে কোলে লইয়া একবারে মহর্ষির চরণযুগলে লম্বমান হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার পদধূলি লইয়া বার বার তাঁহারা নিজেদের দেহে ও রোহিতাশ্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মার্জ্জিত

করিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন,—"ঋষিবর এই অসীম আনন্দসাগরে চিরনিক্ষিপ্ত করিবেন বলিয়াই বুঝি আমাদিগকে এ ক্ষণিক পরীক্ষায় ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন। প্রভু, আপনার চরণে কোটী কোটী নমস্কার ; আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

রাজা-রাণীর আর তখন আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সীমা রহিল না। চক্ষের জলে তখন তাঁহাদিগের বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে অতি কষ্টে সান্ত্বনা করিয়া পুনঃ অযোধ্যার পানে লইয়া চলিলেন।

ধর্ম্মের অবশেষে জয় হইল!

রোহিতাশ্বের পুনর্জ্জীবন-লাভ।

উপসংহার

আমাদের আখ্যায়িকা শেষ হইয়াছে। এখন এই উপসংহারে কেবল মাত্র আর দুই-একটী কথার উল্লেখ করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিব।

হরিশ্চন্দ্র রাজ সিংহাসন গ্রহণ করিলে প্রজাদিগের আর আনন্দের সীমা রহিল না। বিশ্বামিত্র ঋষির রাজত্বে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে অনেক প্রজা রাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল, তাহারা সকলেই এখন আবার ফিরিয়া আসিল, আবার চারিদিকে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল,—অযোধ্যা আবার জয়-জয়কারে ভরিয়া গেল।

মহর্ষিও এই ঘটনার পরে আবার যাইয়া তপোবনে বেশ নিশ্চিন্ত ও সুস্থির হইয়া তাঁহার তপ-জপাদি কার্য্য

সুশৃঙ্খল ভাবে করিতে লাগিলেন। আর তাঁহার ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি-সাধনে কোনও প্রকার বিঘ্ন রহিল না। তিনি আর কাহারও উপর অযথা আর কখনও রাগ করিতেন না। তিনি যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, ক্রমে ক্রমে আবার সেই ব্রাহ্মণে পরিণত হইলেন।

হরিশ্চন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণের পরে একদিন রাজ-সভায় তাঁহার আশ্রয়দাতা চণ্ডালকে ও শৈব্যার আশ্রয়-দাতা ব্রাহ্মণ-পরিবারকে পুরস্কৃত করিবার জন্য ডাকাইয়া আনিলেন। তাঁহারা কেহই প্রকৃত কথা জানেন না। রাজা ডাকিয়াছেন শুনিয়া অতি ভয়ে ভয়ে রাজ সভায় প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহারা একবারে অবাক্ হইয়া গেলেন! গঙ্গারাম শৈব্যাকে রাজ-সিংহাসনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া একবারে আতঙ্কে চমকিয়া উঠিল! তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইযা কপালে যাইয়া ঠেকিল, হাত পা কাঁপিতে লাগিল!

রাজ-দম্পতী তাহার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে নানা মতে অভয় দিয়া নিকটে আনিলেন। তারপর যথারীতি

পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। যাইবার সময় শৈব্যা কহিয়া দিলেন, "ব্রাহ্মণ, ভালরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আবার অযোধ্যায় আসিও, আমি তোমার নিকট তখন শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করিব।"

শুনিয়াছি, গঙ্গারাম আর কখনও অযোধ্যার নিকট দিয়াও পদার্পণ করে নাই! সেই দিন হইতে নাকি তাহার স্বভাবের অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

রাজ্যলাভের কতক দিন পরে এক দিন রাজা রাণীকে নিভৃতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শৈব্যা, আচ্ছা বল দেখি, বিশ্বামিত্রের পরীক্ষায় আমার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লাভ কি?"

শৈব্যা কহিলেন,—"কেন, মহর্ষিই তো বলিয়াছেন —কীর্ত্তি!"

হরিশ্চন্দ্র হাসিয়া কহিলেন,—"ঐটুকু তিনি কপটতা করিয়াছেন! সে পরীক্ষায় আমার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লাভ তুমি! ঋষিবর এ অন্ধের নিকটে তোমাকে পরিচিত করিবার জন্যই এত সব কাণ্ড-কারখানা করিয়া-

ছিলেন—মুখে অন্যরূপ বলিয়াছেন। শৈব্যা, আর তুমি সহস্র অভিমান করিলেও আমি তোমার উপর রাগ করিব না।"

শৈব্যা গলবস্ত্র হইয়া হাতযোড় করিয়া হাসিয়া কহিলেন,—"মহারাজ, তবে তো আমি আর কখনও অভিমান করিব না!"

বাস্তবিক সেইদিন হইতে হরিশ্চন্দ্র আর কখনও শৈব্যার হৃদয়ে অভিমানের চিহ্ন খুঁজিয়া পান নাই।